Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে মহামারীতে মহামনিষীদের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহিদা আক্তার

রোলঃ 227020809

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে মহামারীতে মহামনিষীদের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহিদা আক্তার

রোলঃ 227020809

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যুগে যুগে মহামারীতে মহামনিষীদের ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ------ , আইডিঃ ------- বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যুগে যুগে মহামারীতে মহামনিষীদের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

শাহিদা আক্তার

আইডিঃ 227020809

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

মহামারী ও আজাব ইসলামের দৃষ্টিতে 8

করোনা মহামারি 10

সকাল-সন্ধ্যার বিশেষ দোয়া: 11

করোনার মতো কঠিন রোগ থেকে বাঁচতে বিশ্বনবির আমল: 11

শামের প্লেগ মহামারী: 14

মহামারী থেকে বাঁচতে উমর (রা:) এর কৌশল: 14

আম-ওয়াস মহামারী তে ক্ষয়ক্ষতি 16

হযরত উমর (রা:) এর ভূমিকা বিশ্লেষণ 17

মক্কায় সংঘটিত মহামারি: 18

মক্কা মহামারী তে তৎকালীন আলেম বিজ্ঞ ইমামদের ভূমিকা: 18

তিউনিশিয়ার মহামারি: 19

মহামারীর বিস্তার এবং প্রভাব 19

দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার সুযোগ 20

আন্দালুস (বর্তমান স্পেন) এর মহামারি: 20

পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় মহামারী: 21

মিশরের মহামারি 24

হযরত নুহ (আঃ) -এর প্লাবন এবং গযব : 26

আদ জাতির উপর পতিত গযব 29

আদ জাতির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ 30

'সামুদ'- জাতির উপর আপতিত গযব : 33

হযরত লুত্ব (আঃ) এর কওমের ও গযব 37

যে কারণে তাদের উপর নেমে আসে এ ভয়ংকর শাস্তি:.. 39
আহলে মাদয়িনার আযাব ও গযব :.. 41
হযরত ইউসুফ (আঃ) এর দূর্ভিক্ষ মোকাবিলা :.. 43
অপচয় রোধ এবং সুষম বণ্টন... 46
নিজেই শস্য বণ্টন করতেন ইউসুফ (আ.).. 46
দুর্ভিক্ষের পরের জন্য পরিকল্পনা: 47
বন্যাকালীন সময়ে ইসলামে মনীষীদের 48
অবদান ও আমাদের করনীয়.. 48
ভুকম্পন এ কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী আমাদের করনীয়:.. 51
মহামারী তে মুসলিম হিসেবে করনীয় ও বোঝার বিষয়:.. 53
মহামারী দেখা দিলে করণীয়: 53
আমাদের জন্য শিক্ষা 54
উপসংহার... 56

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানা ওয়ালা আমাদের নানা পরীক্ষা করেন ইমান এর। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সন্তান-কু, সম্পদ, স্বাস্য ইত্যাদি দ্বারা পরীক্ষা করেন। আবার মানবজাতির যুগে যুগে নানা অবাধ্যতা, নাফরমানি, নৈতিক অবক্ষয়, ব্যাহিলিয়াতির জন্য পাঠিয়ে থাকেন, ধ্বংস করে আয়ার-গযব দেন বিভিন্ন জাতিকে। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নানা নমুনা দেখিয়েছেন লুত (আঃ) এর সম্প্রদায়, সামুদ জাতি, আদ জাতিসহ নানা জাতিকে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন।

"প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম"- এবাকটির মতো আমাদের আল্লাহর পাঠানো শাস্তি-আযাব-গজব মহামারি থোক বাঁচতে হলে তাঁর ও রাসুল গোঃ) ও সাহাবাদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে জীবন- যাপন করতে হবে। রাসুল (সাঃ) -এর নির্দেশিত সুন্নাহগুলো অনুসরণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। একইভাবে পবিত্র কুরআন মজিদে উল্লখিত সকল হালাল/হারাম মেনে চলা মুমিন হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের জন্য অপরিহার্য।

ইসলামের ইতিহাসের উমাইয়া ষষ্ঠ খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের তত্ত্বাবধানে দামেস্কে সর্বপ্রথম হাসপাতাল তৈরি করা হয়। নিচে সংক্ষেপে বিভিন্ন মুসলিম জ্ঞানী - বিজ্ঞানী - মনিষীদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে অবদান তুলে ধরা হলোঃ

১. ইবনে-সিনা:

"আল-কুআনন ফিত আল তিব্ব" বিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেখানে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা, রোগ-এর বর্ণনা, পথ্য ইত্যাদি যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিকরন ও কার্যকরী করতে অবদান রেখে আসছে

২. আল-রাযি:

আল-রাযি তার লেখা "কিতাব- আল- হাত্তয়ি"- এ গুটিবসন্ত ও মিসলস এর পার্থক্য নির্ণয় করেন।

৩. আল-যাহরায়ি:

তিনি 'আধুনিক অস্ত্রোপচারের জনক' এবং 'আল- তাশরিফ' বইটির লেখক। এতে বর্ণনা করা হয় আস্ত্রাপচারের যন্ত্রপাতি, পদ্ধতি,' নানা কৌশল, অ্যানেসটেসিয়ার ব্যবহার, রক্তনালির মধ্য দিয়ে নানা চিকিৎসা, এবং বিভিন্ন রোগের অস্ত্রোপচার এর বিশদ বর্ণনা।

৪. ইবনে আল-নাফিস:

তিনি ফসফুসের মধ্যে রক্ত-চলাচল বর্ণনা করেন উইলিয়াম হার্ভের আবিষ্কারের কয়েক শতাব্দী আগেই।

৫. ইবনে-আল- হায়তাম:

তিনি কাঁচ, চশমা, কিভাবে মানুষের দৃষ্টিশক্তি কাজ করে এসকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেন। বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের বিস্তারিত বর্ণনাও তিনি করেন।

মুসলিম গবেষক, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, মনিষীগন ইসলামিক স্বর্ণযুগ যা ছিল অষ্টম থেকে চতুদর্শ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানে। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করা হয় বাগদাদ, কায়রোতে চিকিৎসাসেবা প্রদান, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য, মেডিকেল এথিকস বা চিকিৎসাসেবাকর মূল্যবোধ, হাসপাতাল ব্যবস্থা, রোগীদের সেবা-পথ্য, বিশেষ কক্ষ, কোয়ারেন্টিন, ফার্মেসি ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁরা আমাদের সামনে আনেন, আধুনিক জনস্বাস্থ্য-সেবায় উল্লেখিত ব্যাক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুষম খাবার ব্যায়াম / শরীরচর্চা সহ বেশ বিভিন্ন আর্দশ জীবন পন্থা তাঁরা আধুনিক বিশ্বকে উপহার দিয়ে গেছেন। এমনকি মানসিক স্বাস্থ্য সেবায়ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন মুসলিম মনিষীগন। হাসপাতাল / চিকিৎসালয়ে মানসিক স্বাস্থ্যে ক্ষতিগ্রস্ত রোগীদের আলাদা কক্ষ, থেরাপি, চিকিৎসায় আধুনিকায়ন এবং সূচনা হয় মুসলিমদের হাতেই। এ উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের শুধু মাত্র সূচনাই নয় বরং আধুনিক বিশ্বকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে কৌশলগত, যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক পন্থায় আধুনিক চিকিৎসা- বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে।

মহামারি বিষয়ে আমাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল (সাঃ) এর মূলনীতি আমাদের জানা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। প্রথমত, উসামা বিন জায়েদ রো.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ)

বলেছেন, "তুমি কোনো অঞ্চলে মহামারির প্রাদুর্ভাবের কথা শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না, তবে সেখানে অবস্থানরত সময়ে তা ছড়িয়ে পড়লয়ে সেখান থেকে বের হবে না।"(বুখারি, হাদিস নং: ৬৭২৮)

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসুল (সাঃ) - কে মহামারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি তিনি ইরশাদ করেছেন, "তা একটি আযাব। আল্লাহ তায়ালা যাদের ইচ্ছা তাদের কাছে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা মুমিনদের জন্য রহমত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাই কেউ মহামারিতে আক্রান্ত হলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের আশা করে নিজেদের এলাকায় অবস্থান করে। এ বিশ্বাস রাখবে জন্য যে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য যা নির্ধারিত উপকরন না, তা তিনি সৃষ্টি করেননি। (বুখারি, হাদিস: ০৬৭৮)

কোনো রোগ আপন শক্তিতে মানুষকে আক্রান্ত বা হত্যা করার শক্তি রাখে না, এটাও সত্য। কিন্তু, তাই মহামারি বলে কোনো এলাকায় দেখা দিলে সেখানে অসর্তক অবস্থায় ঘোরাফিরা করার অনুমতিও ইসলাম আমাদের দেয় না, এ কারনে মহানবি রাসুল(সাঃ) বলেছেন, "কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকো যেভাবে তুমি বাঘ থেকে দূরে থাকো।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যেকানো মহামারি বা সংক্রামক রোগকে মহান আল্লাহর হুকুমের চেয়ে শক্তিশালী ভাবার যেমন কোনো সুযোগ নেই, তেমনি এ কোথাও এ ধরনের রোগ দেখা দিলে তাকে অবহেলা করে যথেচ্ছা চলা ফেরারও সুযোগ নেই। বরং সকল বিষয় আল্লাহ তায়ালার অধীনে, হুকুমে ও ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে থাকে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় রেখে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আমাদের উচিৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা।

মহামারী ও আজাব ইসলামের দৃষ্টিতে

পৃথিবীতে যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদ বা সভ্যতা আল্লাহ তা আলার হুকুমে আশা নানা মহামারী ও আজাবে পতিত হয়ে ধবংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তা আলা মানবজাতিকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আজাব দুর্যোগ ও মহামারী পাঠিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রাসুল (স:) এর বেশ কিছু হাদিস আমাদের জন্য ব্যাবস্থাপত্র বা করনীয়-

রাসুল (স:) বলেছেন: উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) থেকে, তিনি সা'দ (রাঃ)-এর কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ যখন তোমরা কোন্ অঞ্চলে প্লেগের বিস্তারের সংবাদ শোন, তখন সেই এলাকায় প্রবেশ করো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান কর, সেখানে প্লেগের বিস্তার ঘটলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। বর্ণনাকারী (হাবীব ইবনু আবু সাবিত বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি কি উসামাহ (রাঃ)-কে এ হাদীস সা'দ (রাঃ)-এর কাছে

বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তিনি (সা'দ) তাতে কোন অসম্মতি জ্ঞাপন করেননি? ইবরাহীম ইবনু সা'দ বলেনঃ হাঁ। [৩৪৭৩]

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, তা একটি আযাব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন তাদের উপর তা প্রেরণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাগণের উপর তা রহমত করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যখন প্লেগে আক্রান্ত জায়গায় সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান করে এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্ তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে তাহলে সে একজন শহীদের সমান সওয়াব পাবে। (৫৭৩৪, ৬৬১৯)

ইসলামের দৃষ্টিতে শরীরের রোগ ব্যাধি দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করা যায়। কোন বস্তু বা ব্যাক্তি কাউকে রোগাক্রান্ত করতে পারে না।

আমার জীবন, মৃত্যু, রোগ ব্যাধি একমাত্র আল্লাহর হাতেই, তাই আল্লাহ যেমন বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করেছেন তেমনি এইগুলোর প্রতিশেধক ও সৃষ্টি করেছেন। বান্দা তাঁর দয়ায় কখনো সেটা জানতে পারে আবার কখনো তা জানতে পারে না।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি যার আরোগ্যের ব্যবস্থা দেননি। (বুখারী হাদিস : ৫৬৭৮)

এ হাদিসটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে কোন রোগ বা মহামারীর নিজর্স কোন ক্ষমতা নেই কাউকে আক্রান্ত করার। আল্লাহ তা আলার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর এসবের দারা আক্রান্ত বা মৃত্যু হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু ইসলামে কোন মহামারী বা আজাবের সময় অবাধ চলাফেরা করা বা জীবন যাপন করার অনুমতি নেই।

কোন এলাকা বা জনপদে মহামারী দেখা দিলে মহানবী (স:) সেখানে যেতে নিষেধ করেছেন আবার সেখান থেকে অন্যথায় চলে যাওয়াকে ইসলামের পক্ষে যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো গর্হিত কাজ বলে গন্য হবে।

এ কারনে রাসুল (স:) বলেছেন, কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে বাঘ থেকে তুমি দূরে থাক।

আবু হুরায়রা (রা:) বর্ননা করেন:এক বেদুইন রাসুল (সা:) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল তবে সেই উট পালের কি অবস্থা যা কোন বালুকাময় প্রান্তরে অবস্থান করে এবং সুস্থ থাকে অতপর কোন খুজলী পাছড়ায় আক্রান্ত উট তাদের মধ্যে এসে পড়ে এবং বাকী উটগুলোকে আক্রান্ত করে ফেলে? এর জবাবে তিনি বলেন- তাহলে প্রথম উটটিকে কে আক্রান্ত করেছিলো? প্রথম উটটিকে যে আল্লাহ আক্রান্ত করেছিলো সেই আল্লাহ তা আলাই বাকী উটগুলোকে আক্রান্ত করেছেন।

অন্য হাদিসে রাসুল (সা:) বলেন: অসুস্থ উটগুলোর মালিক তার উটগুলোকে সুস্থ পশুর দলে পাঠিয়ে দেবে না, কারন এতে ওই সুস্থ প্রানীগুলো রোগাক্রান্ত হতে পারে।

তাই সংক্রামক রোগ গুলোকে মহান আল্লাহর হুকুমের চেয়ে শক্তিশালী ভাবার যেমন কোন সুযোগ নেই তেমনি কোথাও এ ধরনের রোগ দেখা দিলে তাকে অবহেলা করার ও সুযোগ নেই। আমাদের উচিত সর্বোবস্থায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করা এবং আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা।

করোনা মহামারি

করোনার মতো কঠিন রোগ থেকে বাঁচতে বিশ্বনবির আমল-দোয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনা জাতির মধ্যে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে তখন তাদের মধ্যে এমন এমন নতুন রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে; যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।' (ইবনে মাজাহ)

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে শুরু হওয়া প্রাণঘাতী বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও আক্রমণ এখনো থামেনি। নতুন নতুন লক্ষণ ও ধরণ নিয়ে এ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। কোথাও একই লক্ষণ আবার কোনো কোনো অঞ্চলে ভিন্ন লক্ষণ নিয়ে এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ছে।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) নতুন সৃষ্ট সংক্রমণ রোগ। এর আগে বহু সংক্রমণ ভাইরাস সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে হাদিসে। করোনা ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করতে সচেতনার বিকল্প নেই। এ জন্য মাস্ক ব্যবহার ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি।

করোনার মতো কঠিন সংক্রামক নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি ও মহামারী দেখা দিলে তা থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার কথা বলেছেন বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
নতুন নতুন কঠিন রোগ-ব্যাধির বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি দোয়া করতে বলেছেন। হাদিসে এসেছে-

اَللَّهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْاَسْقَامِ -
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল বারাচি ওয়াল জুনুনি ওয়াল ঝুজামি ওয়া মিন সায়্যিয়িল আসক্কাম।' (আবু দাউদ, তিরমিজি)
অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি শ্বেত রোগ থেকে আশ্রয় চাই। মাতাল হয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় চাই। কুষ্ঠু রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। আর দুরারোগ্য ব্যাধি (যেগুলোর নাম জানিনা) থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَ الْاَدْوَاءِ -

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্বি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহওয়ায়ি, ওয়াল আদওয়ায়ি।'
অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ (নষ্ট-বাজে) চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট রোগ বালাই থেকে আশ্রয় চাই।' (তিরমিজি)

সকাল-সন্ধ্যার বিশেষ দোয়া:

এ ছাড়াও অনাকাঙ্ক্ষিত ভাইরাস রোগ ও ব্যধিসহ যে কোনো বিপদাপদ থেকে বেঁচে থাকতে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত আমল করা জরুরি। আর তাতেও কঠিন রোগ থেকে মুক্ত থাকা সহজ হবে। হাদিসে এসেছে-
হজরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিদিন ভোরে ও প্রতি রাতের সন্ধ্যায় যে কোনো বান্দা এ দোয়াটি ৩ বার পাঠ করবে, কোনো কিছুই তার অনিষ্ট/ক্ষতি করতে পারবে না-

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইয়্যুন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস্সামায়ি ওয়া হুয়াস্‌সামিউল আলিম।'
অর্থ : 'ওই আল্লাহ তাআলার নামে, যাঁর নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'(তিরমিজি)

করোনার মতো কঠিন রোগ থেকে বাঁচতে বিশ্বনবির আমল:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَ الْاَدْوَاءِ -

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্বি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহওয়ায়ি, ওয়াল আদওয়ায়ি।'
অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ (নষ্ট-বাজে) চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট রোগ বালাই থেকে আশ্রয় চাই।' (তিরমিজি)

নতুন সৃষ্ট জটিল ও কঠিন রোগ করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকতে হাদিসের ওপর আমল খুবই জরুরি। যে যেখানে অবস্থান করছে, সে ব্যক্তির সেখানে থাকা এবং অন্যকে

নিরাপদ রাখতে মাস্ক ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা খুবই জরুরি। হাদিসের নির্দেশনাও এমন- হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যদি তোমরা মহামারির (নতুন নতুন রোগ-ব্যাধির) কোনো সংবাদ শোন, তো সেখানে (আক্রান্ত অঞ্চলে) তোমরা প্রবেশ কা থেকে বিরত থাক। যদি কোনো শহরে বা নগরে কেউ সে মহামারিতে আক্রান্ত হয়, তো সেখান থেকে তোমরা বের হয়ে (অন্য কোনো অঞ্চলেও) যেয়ো না।’ (বুখারি ও মুসলিম)

৪ তাসবিহ’র আমল

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদিন এক আরব বেদুইন এসে বললেন- হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে (যে কোনো) একটি ভালো আমল শিখিয়ে দিন- তখন এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বেদুইনের হাত ধরলেন। আর তাকে (সামনে বসিয়ে) এ শব্দগুলো শেখালেন এবং বললেন এ শব্দগুলো (৪ তাসবিহ) বেশি বেশি পড়বে-

> سُبْحَانَ اللهِ : সুবহানাল্লাহ; আল্লাহ পবিত্র

> اَلْحَمْدُ لِلهِ : আলহামদুলিল্লাহ; সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য

> لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই

> اَللهُ اَكْبَر : আল্লাহু আকবার; আল্লাহ তাআলাই মহান (সবচেয়ে বড়)।

লোকটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত এ কথাগুলো শুনে কোনো কিছু না বলে ওঠে চলে গেলেন। (অর্থাৎ এ আমলটির ব্যাপারে তার আগ্রহ বাড়েনি)

তারপরের ঘটনা...

কিছুদূর যাওয়ার পর লোকটি কি যেন চিন্তা করে আবারও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে আসে। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাঁকে দেখে) মুচকি হাসলেন।

লোকটি ফিরে এসে প্রিয়নবির সামনে বসে বললেন-

(হে আল্লাহর রাসুল!) ‘সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার’- আপনি যে এ তাসবিহগুলো আমাকে শেখালেন, এ বাক্যগুলো তো আল্লাহর জন্য। এতে আমার জন্য কী রয়েছে? এগুলো পড়লে আমি কী পাবো?

এবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন-

> তুমি যখন বলবে- ‘সুবহানাল্লাহ’; আল্লাহ তাআলা বলবেন- তুমি সত্য বলেছ।

> তুমি যখন বলবে- ‘আলহামদুলিল্লাহ’; আল্লাহ তাআলা বলবেন- তুমি সত্য বলেছ।

> তুমি যখন বলবে- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’; আল্লাহ তাআলা বলবেন- তুমি সত্য বলেছ।

> তুমি যখন বলবে- ‘আল্লাহু আকবার। আল্লাহ তাআলা বলবেন- তুমি সত্য বলেছ।

অতঃপর জিকিরকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজের (কাঙ্ক্ষিত) চাহিদাগুলো (ধারাবাহিকভাবে যা চাইবে) তুলে ধরবে (যেমন)-

> বান্দা বলবে- (اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ) আল্লাহুম্মাগফিরলি, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

> বান্দা বলবে- (اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِىْ) 'আল্লাহুম্মার জুক্বনি' হে আল্লাহ! আপনি আমাকে রিজিক দান করুন। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাকে ইতিমধ্যে রিজিক দান করেছি।'

> বান্দা বলবে- (اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِىْ) আল্লাহুম্মার হামনি' হে আল্লাহ! আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। তখন আল্লাহ বলবেন, ইতিমধ্যে তোমার প্রতি রহম করেছি।

কোনো বান্দা যদি এ ৪ তাসিবহ'র আমল করে আল্লাহর কাছে রোনাজারি করে মহামরি করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে প্রার্থনা করে, তবে হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে মহামারি করোনা ভাইরাস থেকেও মুক্ত রাখবেন। (ইনশাআল্লাহ)

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, সব সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার পাশাপাশি উল্লেখিত হাদিসের আমল, তাসবিহ ও দোয়াগুলোর মাধ্যমে মহামারি করোনা থেকে মুক্তি পেতে বেশি বেশি দোয়া করা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মহামারি করোনা থেকে মুক্ত থাকতে হাদিসের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সচেতন হয়ে সবাইকে যথাযথ আমল ও দোয়ার করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

শামের প্লেগ মহামারী:

প্লেগ এক সময়ে মহামারী রোগ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এবং ভয়ংকরী।

ফিলিস্তিনের আল-কুদস ও রামলার মধ্যভাগে অবস্থিত একটি অঞ্চল হলো আমওয়াস বা ইমওয়াস। সেখানে প্লেগ রোগ প্রথম প্রকাশ পায়। অতঃপর তা সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের ইতিহাসে তা 'তাউন আমওয়াস' নামে পরিচিত। ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল আমওয়াস অঞ্চল পুরোপুরি ধ্বংস করে ওই স্থানে কানাডাভিত্তিক ইহুদি তহবিলের অর্থায়নে একটি পার্ক তৈরি করা হয়। বর্তমানে তা 'কানাডা পার্ক' নামে পরিচিত।

মহামারী থেকে বাঁচতে উমর (রা:) এর কৌশল:

১৭ হিজরি ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে উমর (রা.) দ্বিতীয়বারের মতো শাম পরিদর্শনের জন্য বের হন। ওমর (রা.) শামে পৌঁছার পর শুনতে পান যে সেখানে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। তা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত, উমর বিন খাত্তাব (রা.) শামের উদ্দেশে বের হন। শামে অবস্থিত তাবুক গ্রামের 'সারগ' নামক এলাকার কাছে এলে সেনাপতি আবু উবাদাহ ও অন্য নেতাদের সঙ্গে দেখা হয়। উমর (রা.)-কে তারা অবহিত করল যে শামে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের কথা শুনে উমর (রা.) আমাকে বলেন, 'ইসলামের প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের ডাক দাও।' তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। কেউ বললেন, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশে বের হয়েছেন। তা না করে ফিরে যাওয়া আমরা সমীচীন মনে করছি না। অনেকে বলল, আপনার সঙ্গে অনেক মানুষ ও রাসুল (সা.)-এর মহান সাহাবিরা আছেন। এমতাবস্থায় তাদের নিয়ে আপনি মহামারী আক্রান্ত এলাকায় যাবেন না।
সবার কথা শুনে উমর (রা.) বলেন, 'তোমরা চলে যাও।' অতঃপর উমর (রা.) আমাকে বললেন, 'আনসারদের আমার কাছে ডেকে আনো।' তাদের ডেকে পরামর্শ করলেন। তাদের মধ্যেও মুহাজিরদের মতো মতবিরোধ দেখা দিল। তিনি বললেন, 'তোমরা চলে যাও।' অতঃপর আমাকে বলেন, 'এখানে কুরাইশ বংশের প্রবীণ মুহাজির সাহাবিদের ডাক দাও।' আমি তাদের ডেকে আনি। তাদের মধ্যে দুজনও মতবিরোধ করেনি। সবাই অভিন্ন কথা ব্যক্ত

করে বলল, আমরা মনে করছি, আপনি সব মানুষকে নিয়ে ফিরে যাবেন। মানুষকে এই মহামারীতে নেবেন না।'

অতঃপর উমর (রা.) সবাইকে সামনে নিয়ে ঘোষণা দিলেন, 'আমি চলে যাব। তোমরাও চলে যাও।' [তখন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)] এ কথা শুনে আবু উবায়দা (রা.) বললেন, 'আপনি আল্লাহর তাকদির থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন?' উমর (রা.) বলেন, 'আহ, হে আবু উবায়দা, এমন কথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বলত!' মূলত উমর (রা.) তার মতভিন্নতাকে অপছন্দ করেছেন।

পরে উমর (রা.) আবু উবায়দার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর এক তাকদির থেকে অন্য তাকদিরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছি। যেমন মনে করো, তোমার অনেক উট আছে। তা নিয়ে তুমি এক উপত্যকায় এসেছ। উপত্যকার দুটি প্রান্ত আছে। এক প্রান্ত উর্বর। আরেক প্রান্ত শুষ্ক। তুমি উর্বর প্রান্তে উট চরালে কি আল্লাহর তাকদিরের ওপর নির্ভর করবে না? এবং শুষ্ক প্রান্তে চরালেও কি আল্লাহর তাকদিরের ওপর নির্ভর করবে না?'

কিছুক্ষণ পর আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) এলেন। কোনো এক প্রয়োজনে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ বিষয় সম্পর্কে আমার জ্ঞান আছে। আমি রাসুল (সা.)-এর কাছে শুনেছি, 'তোমরা কোনো অঞ্চলে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। তবে সেখানে থাকাবস্থায় প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লে তোমরা সেখান থেকে বের হবে না।' এ কথা শুনে উমর (রা.) আলহামদুলিল্লাহ বললেন। অতঃপর সবাই ফিরে গেলেন।' (বুখারি, হাদিস: ৫৭২৯)

উমর (রা.) মহামারি চরম আকার ধারণের খবর পান। তখন তিনি চাইলেন সেনাপতি আবু উবায়দা (রা.)-কে ফিরিয়ে আনতে। তাই উমর (রা.) একটি চিঠি লিখলেন, 'তোমার ওপর শান্তি বর্ষণ হোক। তোমার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ
সম্পর্কে সরাসরি তোমাকে বলতে চাই। তাই তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলছি, আমার পত্র পড়ে আমার উদ্দেশে বের হওয়ার আগে পত্রটি তোমা করবে না। রাতে পত্র পৌঁছালে সকাল হওয়ার আগেই যাত্রা শুরু 5-6/11 দিনের বেলায় পৌঁছালে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই যাত্রা শুরু করবে।' আবু উবায়দা (রা.) পত্র পড়ে উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমিরুল মুমিনিনকে ক্ষমা করুন।' অতঃপর উমর (রা.)-এর উদ্দেশে একটি পত্র লেখেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আপনার প্রয়োজনের বিষয় বুঝেছি। আমি এখন মুসলিম

সেনাবাহিনীতে অবস্থান করছি। তাদের ছেড়ে যেতে চাই না। আল্লাহতায়ালা আমিসহ সবার ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। অতএব হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে মুক্ত করুন। আমার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আমাকে থাকতে দিন।'

আবু উবায়দা (রা.)-এর পত্র পড়ে উমর (রা.) কাঁদতে শুরু করেন। আশপাশের লোকজন ও সঙ্গীরা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আবু উবায়দা কি শহীদ হয়েছেন? উমর (রা.) বলেন, 'না, তিনি এখনো শহীদ হননি। কিন্তু...।'

অর্থাৎ শিগগির তিনি শহীদ হবেন। এর পরই আবু উবায়দা (রা.) প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/৪৪)

আম-ওয়াস মহামারী তে ক্ষয়ক্ষতি

এ ভয়াবহ মহামারীতে বড় বড় সাহাবীগন শাহাদাত বরন করেন। তাদের মধ্যে আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা:), মুয়াজ বিন বেলাল (রা:), ইয়াজীদ বিন আবু সুফিয়ান (রা:), হারিস বিন হিসাস (রা:), সুহাইল বিন আমর (রা:) সহ আরো অনেকেই রয়েছেন।

শামের অধিবাসী ইসলাম গ্রহনের পর মুসলিম সের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০-৩৬ হাজারের মতো।

তখন মহামারীতে মুসলিম সেনাবাহিনীতে প্রায় ২৫-৩০ হাজার এর মতো সৈন্য শাহাদাত বরন করেন। যার ফলে সেনাবাহিনীর মাত্র এক তৃতীয়াংশ বহাল থাকে।

হযরত উমর (রা:) এর ভূমিকা বিশ্লেষণ

যখন হযরত উমর (রা:) এ বিষয় জানতে পারলেন তখন তিনি সবার সাথে আলাপ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ইসলামী শরিয়া অনুসারে কোন সমস্যা বা বিপদ আসলে সকলের সাথে পরামর্শ করে অধিক মতের উপর মিল রেখে ফায়সালা গ্রহন করতে হয়। কোন মহামারী বা প্রচলিত রোগের চিকিৎসার ব্যাবস্থা করতে হবে। কারন চিকিৎসার যাবতীয় জিনিস গ্রহনের পরেও আমাদের আল্লাহর দেয়া তাকদীর এর উপর ভরসা করতে হবে। কারন তিনি তা জানেন আমরা তা জানি না। তিনি গায়েব জানেন, আমরা জানি না।

তাউন ইমউয়াস এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে তা হলো হযরত উমর (রা:) এর সেনাপতি উবায়দা (রা:) এর মতামত কে সম্মান দেখান, যদিও সেই মতামত আমাদের খলীফা উমর (রা:) এর মতামত এর সাথে বিপরীতে ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নির্ধারন করা তাকদীর এর উপর ঈমান এনে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো ইসলামী শরীয়াহ এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

মক্কায় সংঘটিত মহামারি:

পৃথিবীর অন্যান্যা অঞ্চলের মতো পবিত্র নগরী মক্কাতেও মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। ৮২৭ হিজরীতে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এই নগরীতে।

প্রখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞ আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) ৮২৭ হিজরিতে মক্কায় প্রকাশ পাওয়া মহামারীর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'এ বছরের শুরুতে মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন ৪০ এরও বেশি লোক মারা গিয়েছে। শুধু রবিউল আউয়াল মাসে **১৭শ**য়ের বেশি লোক মৃত্যুবরণ করেছে। ওই সময় কেবল দুজনকে নিয়ে মাকামে ইবরাহিমের সামনে (শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী) ইমাম নামাজ পড়তেনা। আর অন্যান্য মাজহাবের অনুসারী ইমামরা মুসল্লির অভাবে নামাজের ইমামতি করত না। তবে এখানে নামাজ পুরোপুরি বন্ধ থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। মৃতের সংখ্যা, অসুস্থ ব্যক্তি ও সংক্রামক রোগ-ব্যাধির কারণে মানুষের উপস্থিতি তেমন ছিল না। কারণ মহামারী সংক্রমণের ভয় সবার মধ্যে। (আনবাউল গুমরি ফি আবনাইল উমুরি, ৩/৩২৬)

মক্কা মহামারী তে তৎকালীন আলেম বিজ্ঞ ইমামদের ভূমিকা:

মক্কায় মহামারীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হ ওয়ায় হারাম এবং অন্যান্য মসজিদ গুলোতে উপস্থিতির সমাগম ঘটে নি মানুষের। এ সময়ে যে সকল ঈমাম শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী তারা সে মাজহাব অনুসারে পেছনে দুই জনকে নিয়ে জামাত করেছেন। অর্থাৎ প্রতিকুল পরিস্থিতিতে পরিপূর্ণ রুপে ইবাদত না করতে পারলেও যথা সম্ভব তাঁরা চেস্টা চালিয়ে গেছেন এবং নুন্যতম অপরিহার্য কাজগুলো ঠিক রেখে আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুযায়ী আমল করেছেন।

সর্বোপরি যে যে মাজহাব এর অনুসারী সে সে মাজহাব অনুসরনের চেস্টা আমাদের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

তিউনিশিয়ার মহামারি:

মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের মহামারী এবং দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, যা শুধুমাত্র জীবনকে বিপর্যস্ত করেইনি, বরং মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিউনিশিয়া, যা তখন ইসলামের প্রভাবাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল, ৩৯৫ হিজরিতে একটি ভয়াবহ মহামারীর কবলে পড়ে। তিউনিশিয়ার এই মহামারি বর্ণনা করেছেন সপ্তম শতাব্দীর মরক্কোর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **ইবনে আজারি মারাকাশি**, যিনি তার গ্রন্থ *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*-এ এই মহামারীর ভয়াবহতা এবং তার পরিণতি তুলে ধরেছেন।

এই মহামারী শুধু প্রাণহানির কারণ হয়নি, বরং এতে ছিল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ও। মহামারীর ফলে তিউনিশিয়ার অন্যতম প্রধান নগরী **কাইরাওয়ান**-এর মসজিদগুলো পুরোপুরি শূন্য হয়ে পড়েছিল, এবং হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। এর পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বস্ত্রের অভাব দেখা দেয়, যা ধনী-গরীব সবার জন্যই একটি বড় সংকট সৃষ্টি করে। ধনীরা তাদের সম্পত্তি হারাতে শুরু করে, এবং সাধারণ মানুষ চিকিৎসা ও মৃত দাফনকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মহামারীর বিস্তার এবং প্রভাব

৩৯৫ হিজরির মহামারী তিউনিশিয়ার কাইরাওয়ান শহরে মারাত্মক আকার ধারণ করে। কাইরাওয়ান ছিল ইসলামী সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, যেখানে বহু ধর্মীয়, রাজনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চলত। এই শহরের মসজিদগুলো, যেগুলো মুসলিম সমাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, জনশূন্য হয়ে পড়ে। ইবনে আজারি মারাকাশি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:
"কাইরাওয়ান নগরীর মসজিদগুলো বিরান হয়ে পড়েছিল।"
এটি সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় কার্যক্রমের স্তব্ধতার একটি বড় চিত্র।

এ মহামারীর কারণে চিকিৎসা এবং মৃতের দাফনকর্মে এমনভাবে ব্যস্ততা শুরু হয় যে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুরোপুরি থেমে যায়। চিকিৎসকের অভাব এবং মহামারীর প্রকোপে সবাই সুরক্ষার জন্য বাড়ির মধ্যে থাকতে শুরু করে। অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে পড়ে যে, দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনীয় বস্ত্রের অভাব দেখা দেয় এবং এর ফলে ধনীরা পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার সুযোগ

ইবনে আজারি মারাকাশি যেভাবে তিউনিশিয়ার মহামারীকে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই ধরনের বিপর্যয় কেবলমাত্র মানবজাতির দুঃখ-কষ্টের একটি অংশ নয়, বরং এটি আল্লাহর পাঠানো পরীক্ষা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। ইসলামে কোনো ধরণের বিপদ বা মহামারীকে এক ধরনের পরীক্ষা হিসেবে দেখা হয়, যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য পাঠানো হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের ধৈর্য, বিশ্বাস, এবং ইবাদতের মাত্রা পরীক্ষা করা হয়।

মহামারী, দুর্ভিক্ষ বা অন্যান্য দুঃখ-কষ্ট যখন মানুষের জীবনে আসে, তখন এটি আল্লাহর নির্দেশ এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ প্রদান করে। মুসলমানদের জন্য এটি একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হতে পারে, যেখানে তারা আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে।

এ মহামারীর দিকে লক্ষ্য করলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয় যে কোন পরিস্থিতি তে বা যে কোন অবস্থায় আমাদের শুধুমাত্র এক ও অদিতীয় সর্ব শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী, এক মাত্র সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ কে ভয় করা এবং তাঁর শরীয়া অনুযায়ী কাজ করা।

আন্দালুস (বর্তমান স্পেন) এর মহামারি:

ইসলামের স্বর্ণযুগের অন্যতম কেন্দ্র আন্দালুস (বর্তমান স্পেন) ইতিহাসে সমৃদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার প্রতীক। তবে এই অঞ্চল নানা সংকট ও বিপদের মুখোমুখিও হয়েছে। ৪৪৮ হিজরি (১০৫৬-১০৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে আন্দালুসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দিয়েছিল, যা সে সময়ের মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

প্রখ্যাত হাদিস বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ইমাম জাহাবি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *তারিখুল ইসলাম* এবং *সিয়ারু আলামিন নুবালা*-তে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ৪৪৮ হিজরির মহামারি ও দুর্ভিক্ষ আন্দালুসের গ্রানাডা অঞ্চলে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় ছিল যে, বিপুলসংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে মসজিদগুলো মুসল্লি শূন্য হয়ে পড়েছিল। এমনকি অনেক মসজিদ বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনা সে সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

অন্যদিকে, কর্ডোভা নগরী, যা ইসলামী সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল, মহামারি ও দুর্ভিক্ষের এ ধরনের ভয়াবহতার মুখোমুখি হয়নি। ফলে এ ঘটনা ইতিহাসে "ক্ষুধার বছর" নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।(তারিখুল ইসলাম, সিয়ারু আলামিন নুবালা)

মহামারির প্রভাব

১. মানবিক বিপর্যয়:

এত বিপুলসংখ্যক মানুষের মৃত্যু আন্দালুসের সামাজিক কাঠামোতে বড় ধরনের ফাটল সৃষ্টি করেছিল। গ্রানাডার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মসজিদগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া, জনজীবনের বিপর্যয় এবং ধর্মীয় চর্চার অবসান মানুষকে চরম হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

২. অর্থনৈতিক দুর্যোগ:

মহামারি ও দুর্ভিক্ষ একসঙ্গে দেখা দেওয়ায় খাদ্যাভাব তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ফলে সামাজিক অস্থিরতা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম সংকট দেখা দেয়।

৩. ধর্মীয় চর্চার বাধা:

মসজিদ বন্ধ হওয়া এবং মুসল্লি না থাকা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। এটি সেখানকার মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় মহামারী:

আল্লামা ইবনুল জাওজি (রহ.) [মৃত্যু:৫৯৭ হি.] মধ্য এশিয়া ছড়িয়ে পড়া ভয়ংকর মহামারীর কথা বর্ণনা করেছেন। প্রায় ২০ লাখের মতো লোক মৃত্যুবরণ করে এতে।

তিনি লিখেছেন, '৪৪৯ হিজরির জুমাদাল উখরায় 'মাওয়ারাআন নাহার' বা ট্রান্সঅক্সিয়ানার ব্যবসায়ীদের একটি পত্র পাওয়া যায়। সেখানে সীমাহীন কষ্টের এক মহামারী দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন এই অঞ্চল থেকে ১৮ হাজার মৃতদেহ দাফনের জন্য বের করা হয়েছে। এই পত্র লেখা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৬ লাখ ৫০ হাজারের মতো!'

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশের চিত্রের সঙ্গে তা পুরোপুরি সম্পূরক। তিনি বর্ণনা করেছেন, 'এই অঞ্চলে মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল। কিন্তু এখন আর মানুষের কোনো চিহ্নও দেখা যায় না। সব বাজার বিরান হয়ে আছে। জনশূন্য পথ-ঘাট। সব ঘরের দরজাও বন্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সব কাজকর্ম থেমে আছে। মানুষের রাত-দিনের পুরো সময় কাটে মৃতলোকদের গোসল ও দাফনের ব্যবস্থা করতে করতে। বেশির ভাগ মসজিদ মুসল্লিশূন্য হয়ে পড়ে আছে।' (আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল উমাম, ১৬/১৭)

ইসলামের স্বর্ণযুগে মধ্য এশিয়া তথা বর্তমান উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, ও তুর্কমেনিস্তান অঞ্চলের মহামারীর ভয়াবহ চিত্র আল্লামা ইবনুল জাওজি (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ **আল-**

মুনতাজাম ফি তারিখিল উমাম-এ তুলে ধরেছেন। তাঁর বর্ণনায় ৪৪৯ হিজরির মহামারী ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই মহামারীতে প্রায় বিশ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

৪৪৯ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে ট্রান্সঅক্সিয়ানা বা 'মাওয়ারাআন নাহার' অঞ্চলে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ট্রান্সঅক্সিয়ানা ছিল ইসলামের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা মধ্য এশিয়া থেকে অন্যান্য অঞ্চলে পণ্য রপ্তানি করতেন। ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় স্থানীয় মানুষের ওপর এই মহামারী মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

ইবনুল জাওজি একটি ব্যবসায়ীর পত্র উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছিল:

"প্রতিদিন এই অঞ্চল থেকে ১৮ হাজার মৃতদেহ দাফনের জন্য বের করা হয়েছে। পত্র লেখা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬ লাখ ৫০ হাজার।"

এই চিঠি কেবলমাত্র একটি অঞ্চলেই কীভাবে মহামারী মৃত্যু মিছিল তৈরি করেছিল, তা স্পষ্ট করে।

মহামারীর কারণে সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। তিনি লিখেছেন:

"এই অঞ্চলে মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল। কিন্তু এখন আর মানুষের কোনো চিহ্নও দেখা যায় না। সব বাজার বিরান হয়ে আছে। জনশূন্য পথ-ঘাট। সব ঘরের দরজাও বন্ধ।"

মহামারী শুধুমাত্র প্রাণহানি ঘটায়নি, বরং অর্থনীতিকেও বিপর্যস্ত করে দেয়। বাজার এবং বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ দিনের পর দিন নিজেদের পরিবার এবং প্রিয়জনের জানাজা, গোসল, এবং দাফন নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

ইবনুল জাওজি মসজিদের অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন:

"বেশির ভাগ মসজিদ মুসল্লিশূন্য হয়ে পড়ে আছে।"

মহামারীর কারণে মসজিদে নামাজ আদায়কারী মানুষের সংখ্যা কমে যায়। মুসল্লিদের অনুপস্থিতি দেখায় যে, মানুষের জীবনধারণে কতটা দুর্ভোগ নেমে এসেছিল। মানুষ এমনকি নিজ ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতেও সক্ষম ছিল না।

মধ্যযুগীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে মহামারীর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের কোনো কার্যকর উপায় ছিল না। মহামারী ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্যকর্মীরা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। কোনো কার্যকরী ওষুধ বা প্রতিষেধক না থাকায় সংক্রমণ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

মহামারীর আরেকটি দিক ছিল জনজীবনের সম্পূর্ণ পতন। মানুষ রাত-দিন কেবল মৃত ব্যক্তিদের দাফন এবং জানাজার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ইবনুল জাওজি উল্লেখ করেছেন:

"মানুষের রাত-দিনের পুরো সময় কাটে মৃতলোকদের গোসল ও দাফনের ব্যবস্থা করতে করতে।"

যারা বেঁচে ছিল, তাদের জীবনে এক ধরনের মানসিক আঘাত নেমে আসে। একের পর এক প্রিয়জনকে হারানো মানুষের মানসিক শক্তি ভেঙে দেয়। মহামারীর ভয়াবহতা কেবল শারীরিক মৃত্যুতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ছিল একটি মানসিক ও সামাজিক বিপর্যয়।

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশের চিত্রের সঙ্গে তা পুরোপুরি সম্পূরক। তিনি বর্ণনা করেছেন, 'এই অঞ্চলে মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল। কিন্তু এখন আর মানুষের কোনো চিহ্নও দেখা যায় না। সব বাজার বিরান হয়ে আছে। জনশূন্য পথ-ঘাট। সব ঘরের দরজাও বন্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সব কাজকর্ম থেমে আছে। মানুষের রাত-দিনের পুরো সময় কাটে মৃতলোকদের গোসল ও দাফনের ব্যবস্থা করতে করতে। বেশির ভাগ মসজিদ মুসল্লিশূন্য হয়ে পড়ে আছে।' (আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল উমাম, ১৬/১৭)
আল্লামা ইবনুল জাওজির বর্ণনা আজকের আধুনিক বিশ্বের মহামারীর চিত্রের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন সাম্প্রতিক (কোভিড-১৯) মহামারীতে আমরা দেখেছি কিভাবে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সামাজিক দূরত্ব, বাজার এবং বাণিজ্যের বন্ধ হয়ে যাওয়া, চিকিৎসা সংকট, এবং মানুষের জীবনধারণের অচলাবস্থা ইবনুল জাওজির বর্ণিত চিত্রের সঙ্গে অনেকাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইবনুল জাওজির এই বর্ণনা আমাদেরকে মধ্যযুগীয় সমাজ এবং মহামারীর প্রভাব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেয়। এটি কেবল ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা নয়, বরং মানবজাতির সংকটকালীন সময়ের শিক্ষার উৎস। মহামারী কীভাবে সমাজব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারে এবং এই সংকট মোকাবিলায় আমাদের কী প্রস্তুতি থাকা উচিত, তা বুঝতে সাহায্য করে।
৪৪৯ হিজরির মহামারী একটি মর্মান্তিক অধ্যায়। আল্লামা ইবনুল জাওজি এই মহামারীর ভয়াবহতা তার লেখায় নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। এটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়, মানবজাতি যুগে যুগে মহামারী এবং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রতিবারই তা মোকাবিলার মাধ্যমে শক্তি এবং শিক্ষা অর্জন করেছে।

মিশরের মহামারি

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, ৮৪৮ হিজরিতে মিসর একটি ভয়াবহ মহামারীর কবলে পড়ে। এ মহামারী শুধু মৃত্যুর মিছিলই দীর্ঘায়িত করেনি, বরং পুরো সমাজের জীবনযাত্রায় বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল। এই মহামারীর ভয়াবহতা, তা প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং মুসলমানদের আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে স্থান পেয়েছে।

মহামারীটির শুরুতে মিসরে প্রতিদিন এক থেকে দুই শত লোক মৃত্যুবরণ করছিল। যদিও এটি স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল, হেজায থেকে হাজীদের ফিরে আসার পর পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। হাজীদের সাথে মেলামেশা এবং অভ্যর্থনা জানাতে প্রচুর লোক জমায়েত হয়। জনসমাগমের এই ঘটনা মহামারী ছড়িয়ে পড়ার জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এর ফলে মৃত্যুর হার দ্রুত বেড়ে দৈনিক এক হাজার ছাড়িয়ে যায়।

মহামারীর এই দ্রুত বিস্তার ইবনু হাজারের রচনায় উঠে এসেছে। তিনি বলেন, মিসরের এক ব্যক্তিত্ব কাযী ইবনু আবী জারদাহ মহামারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে ঘরে সীমাবদ্ধ রাখেন। এমনকি তিনি অসুস্থতার ভান করেন যাতে তাকে কোনো জানাজায় অংশগ্রহণ করতে না হয়। এটি মধ্যযুগীয় সমাজে কোয়ারেন্টাইনের গুরুত্বের একটি উদাহরণ হিসেবে উঠে আসে। করে। ইবনু হাজার বলেন, মহামারীতে থেকে বাঁচতে কাযী ইবনু আবী জারদাহ বাড়িতে অবস্থানের জন্য ডাক্তারকে অর্থ দেন। এবং তিনি অসুস্থতার ভান করেন। যাতে তাকে কোন জানাযায় ডাকা না হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে মহামারী থেকে নাজাত দেন। (ইনবাউল গুমার)

এরকম সংকটপূর্ণ সময়ে মুসলমানরা কখনোই আল্লাহ তায়ালা নিকটবর্তিতা এবং তাঁর কাছে দোয়া করার কথা ভুলে যায়নি। মহামারীর সময়ে মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হন। পাপ কাজ এবং অসৎ অভ্যাস থেকে দূরে থাকার একটি প্রবণতা দেখা যায়। নেককার ও সৎ ব্যক্তিরা তওবা এবং ইস্তেগফারে মগ্ন হন। ইবাদতের মাধ্যমে তারা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।অধিক পরিমাণে ইবাদতে লিপ্ত হয়েছেন। আল্লাহর প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য তারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন মদের দোকান এবং বিনোদন কেন্দ্রগুলোকে।

মানুষ দূর হয়ে গিয়েছিল অসৎ কাজ এবং পাপাচারের জগত থেকে। সেই সাথে সোশ্যাল ডিস্টান্স তথা কোয়ারেন্টাইন বিষয়েও দরকারি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তারা।

মহামারী নিয়ন্ত্রণে কোয়ারেন্টাইনের গুরুত্ব সে সময়কার মুসলিম বিশ্ব খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোতে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার পর, শাসকরা সঙ্গনিরোধের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মরক্কোর শাসক সাইয়িদি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ মহাসড়কগুলোতে সামরিক পাহারা বসান। এই ব্যবস্থা মহামারীর বিস্তারকে ধীরগতি করতে সহায়তা করে।

এর আগেও, ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় মহামারীর প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই সময় মরক্কোর টাঙ্গিয়ারে একটি বিশেষ কাউন্সিল গঠন করা হয়। তারা সমুদ্রপথে সংক্রমণ রোধে ব্যবস্থা নেয় এবং কোয়ারেন্টাইনের আদেশ জারি করে। একইভাবে, মাওলা সুলাইমান আলজেরিয়ায় কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালু করেন। এই পদক্ষেপগুলো মহামারীর প্রকোপকে পুরোপুরি রোধ করতে না পারলেও এর বিস্তারকে বিলম্বিত করেছিল।

আলজেরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর মহামারীর আগমনকে বিলম্বিত করতে মরক্কোর শাসক সাইয়িদি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ মরক্কোর মহাসড়কগুলোতে বসিয়েছিলেন সামরিক পাহাড়া। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে এই মহামারী থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা প্রণয়নে টাঙ্গিয়ারে একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল।

তারা সামুদ্রিক দিক থেকে সংক্রমন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কোয়ারেন্টিনের আদেশ দিয়েছিলেন। এর আগে মাওলা সুলাইমান মহামারী আক্রান্ত আলজেরিয়াতে কোয়ারেন্টিন আবশ্যক করেছিলেন।

মহামারীটি শুধুমাত্র মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করেনি, বরং এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। জানাজা এবং দাফন নিয়ে ব্যস্ত মানুষ জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।

মিসরের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলে জনজীবনের এই বিপর্যয় আর্থসামাজিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলে। অনেকেই তাদের পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মানুষের মনে আতঙ্ক এবং হতাশা বাড়তে থাকে।

হযরত নুহ (আঃ) -এর প্লাবন এবং গযব :

হজরত নুহ (আ.) প্রাচীন নবীদের একজন। কোরআনে হজরত নুহ (আ.)-এর আলোচনা ৪২ জায়গায় এসেছে। মানবজাতিকে এক আল্লাহর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং আমার কথা মানো। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।'

আল্লাহ নুহ (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন, তোমার জাতির যেসব লোক ইমান এনেছে, তাদের ছাড়া অন্য কেউ আর ইমান আনবে না। এ নিয়ে তুমি কোনো দুঃখ কোরো না। তুমি একটি নৌকা বানাও।

হজরত নুহ (আ.) আল্লাহর আদেশ মেনে একটি বিরাট নৌকা বানাতে শুরু করেন।

হজরত আদম (আ.)-এর সন্তানেরা ধীরে ধীরে আল্লাহর কথা ভুলে যেতে করেছিল। যে মহান আল্লাহ তাদের সৃষ্টি ও প্রতিপালন করেছেন, তাঁর স্মরণ থেকে তারা বিমুখ হতে লাগল। শয়তানের প্ররোচনায় তারা পৌত্তলিক হয়ে উঠতে শুরু করল। এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনা করতে লাগল। আল্লাহ অপরিসীম দয়ালু। তাই তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য হজরত নুহ (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন।

কিন্তু লোকেরা হজরত নুহ (আ.)-এর কথায় কর্ণপাত করল না। কিন্তু তিনি মনোবল না হারিয়ে তাদের বোঝাতে লাগলেন, 'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি বড় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে তোমরা ফসল উৎপন্ন করতে পারো। আর সে ফসল দিয়ে তোমরা বড় বড় বাগান সাজাতে পারো। আল্লাহ পানি দিয়ে তোমাদের পৃথিবীতে নদ-নদী তৈরি করে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের সন্তানসন্ততি এবং ধনসম্পদ দান করেন। তোমাদের কী হলো যে তোমরা সে আল্লাহকেই মানছ না! অথচ তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং অবশেষে একদিন তোমরা এ মাটিতেই মিশে যাবে। কিয়ামতের দিন এই মাটি থেকেই

তিনি পুনরায় তোমাদেরকে ওঠাবেন। সুতরাং হে লোকেরা! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো।'

এ কথা শুনে তারা বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছ। যদি তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আনো দেখি সেই আজাব, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ!'নুহ (আ.) বললেন, 'আল্লাহ যখন চাইবেন আজাব কেবল তখনই আসবে।'

তাঁর স্বজাতির নেতারা নৌকা বানাতে দেখে তাঁকে ঠাট্টা-তামাশা করত। তিনি বলতেন, যখন আল্লাহর প্রতিশ্রুত আজাব আসবে, তখন টের পাবে।

অবশেষে আল্লাহর প্রতিশ্রুত আজাব শুরু হলো। মাটি ফেটে পানি বেরোতে লাগল। আকাশ থেকে নামল ভারী বর্ষণ। আল্লাহ হজরত নুহ (আ.)-কে বললেন সব প্রাণীকে নারী-পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় উঠিয়ে নিতে। যারা বিশ্বাসী, হজরত নুহ (আ.) তাদের বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে তোমরা নৌকায় চড়ে বসো। নৌকা তাদের নিয়ে ভাসতে লাগল।

হজরত নুহ (আ.) তাঁর সন্তানকে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নৌকায় চড়ে বসো। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে থেকো না।'

ছেলে দম্ভভরে বলল, 'আমি কোনো পাহাড়ে উঠে পড়ব, তখন এই পানি থেকে মুক্তি পেয়ে যাব।'

হজরত নুহ (আ.) বললেন, 'আল্লাহর আজাব থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবেন না।' কিন্তু তার ছেলে বাবার কথার কোনো মুল্য দিলো না। অত:পর পানিতে ডুবে গিয়ে তাকে মৃত্যুবরন করতে হয়েছিল।।

অনেক দিন পর পানির বর্ষণ বন্ধ হলো। হজরত নুহ (আ.)-এর নৌকা জুদি পর্বতে গিয়ে ঠেকল। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার ছেলেও আমার পরিবারের সদস্য। আর আপনার ওয়াদা নিশ্চয় সত্য। আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার পরিবারকে বাঁচিয়ে দেবেন, তাহলে আমার ছেলে কেন ডুবে মরল!'

আল্লাহ বললেন, 'তোমার ছেলে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। কেননা তার কাজ ভালো ছিল না। আর এমন ব্যাপারে আমার কাছে আবেদন কোরো না, যে ব্যাপারে তোমার জানা নেই।'

নুহ (আ.) জানতেন না যে তাঁর ছেলে 'কেনান' অবিশ্বাসী ছিল। হজরত নুহ (আ.) আল্লাহর কাছে অনুশোচনা করে তাওবা করলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। কেননা আল্লাহ মহান, দয়াশীল।।।

এরপর নুহ (আ.)-এর উম্মত দুনিয়ায় বসবাস করতে লাগল। ধীরে ধীরে তাদের সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি পেতে লাগল। তারা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করে চলল।

আদ জাতির উপর পতিত গযব

ইতিহাসের শক্তিশালী গোত্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল আদ গোত্র। মাত্র ১৩ পরিবারের গোত্র হলেও ব্যাপক এলাকাজুড়ে ছিল তাদের অবস্থান। তাদের বসতি ছিল আম্মান থেকে শুরু করে হাজরামাউত ও ইয়ামান পর্যন্ত।

সে সময়ের অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামলে ভরপুর ছিল তাদের তাদের খেত-খামার। সব ধরনের বাগ-বাগিচাও ছিল তাদের। তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসের কারণে অন্য সবার চেয়ে তারা ছিল স্বতন্ত্র এক জাতি। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমের একাধিক স্থানে তাদের এ বিষয়গুলো ওঠে এসেছে-

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ - ازم ذَاتِ الْعِمَادِ - الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ)

তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিলেন;

সুদীর্ঘ দেহের অধিকারী ইরাম (আদ) গোত্রের সঙ্গে? যার সমতুল্য (এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী) জাতি এর আগে অন্য কোনো দেশে (পৃথিবীতে) সৃষ্টি হয়নি।' (সুরা ফজর: আয়াত ৬-৮)

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুকাতিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে একটি ইসরায়েলি বর্ণনা এভাবে তুলে ধরেছেন যে, 'তাদের উচ্চতা ছিল ১৮ ফুট (১২ হাত)।

আদ জাতির প্রতি আল্লাহর নির্দেশ

অন্য আয়াতে কাওমে নুহের পর তাদের প্রতি করণীয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরো ঘোষণা করেন-

أو عجبتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ (بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا أَلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে; যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে? স্মরণ কর! আল্লাহ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের (আদ জাতির) অবয়ব ও শক্তিতে (অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর) সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।' (সুরা আরাফ: আয়াত ৬৯)

হজরত নুহ আলাইহিস সালামের পর আল্লাহ তাআলা আদ জাতির কাছে হজরত হুদ আলাইহিস সালামকে দিকনির্দেশনাসহ নবি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ ঘোষণা দেন-

و إِلَى عَادٍ أَخَاهُمَ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

'আদ জাতির কাছে ওদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো (সত্যিকার) উপাস্য নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না?' (সুরা আরাফ, আয়াত: ৬৫)

আয়াতে ঘোষিত এই আদ সম্প্রদায় হল প্রথম আদ। যাদের বাসস্থান ইয়ামানের বালুময় পাহাড়ে ছিল। আর শক্তি-সামর্থ্যে তারা ছিল অতুলনীয়। তাদের নিকট হুদ আলাইহিস সালাম নবি হয়ে এসেছিলেন; যিনি তাদেরই মধ্যেকার একজন ছিলেন। আদ জাতির ধ্বংসের কারণ

এই আদ জাতি ছিল মূর্তিপূজারী। মূর্তিপূজাসহ তারা আরো নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল। হজরত হুদ আলাইহিস সালাম তাদের মূর্তিপূজা ছেড়ে আল্লাহর একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং সব ধরনের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্জন করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে বলেছিলেন। কিন্তু

তারা নিজেদের ধনৈশ্বর্যের মোহে নিমজ্জিত হয়ে তাঁর (হুদ আলাইহস সালাম) আদেশ অমান্য করে। সুরা আরাফে তা ধারাবাহিকভাবে ওঠে এসেছে এভাবে-

(قَالَ المَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ

'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল, 'আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।' (সুরা আরাফ: আয়াত ৬৬)

(قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَ لٰكِنِّى رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِينَ

'সে (হুদ আলাইহিস সালাম) বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রাসুল।' (সুরা আরাফ: আয়াত ৬৭)

(أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ

'আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি

তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী (উপদেষ্টা)।' (সুরা আরাফ: আয়াত ৬৮)

أو عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ (بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا أَلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে; যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে? স্মরণ কর! আল্লাহ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের (আদ জাতির) অবয়ব ও শক্তিতে (অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর) সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।' (সুরা আরাফ: আয়াত ৬৯)

(قَالُوا أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحدَهُ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدْنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ

'তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছে যে, আমরা যেন শুধু আল্লাহর উপাসনা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার উপাসনা করতো তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে (আযাবের) ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।' (সুরা আরাফ: আয়াত ৭০)

এরপর আদ জাতির প্রতি শাস্তি....

আদ জাতি তাদের নবি হজরত হুদ আলাইহিস সালামের কথা অমান্য করে পাপাচারে লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা আদ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। তাদের প্রতি প্রথম আজাব ছিল অনাবৃষ্টি। তিন বছর তাদের এলাকায় বৃষ্টি বন্ধ ছিল।

এতে তাদের সব ফসল জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ফলে দেশে অভাব দেখা দেয়। এরপরও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। তারপর আট দিন সাত রাত তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়। এতে তাদের বাড়ি-ঘর, বাগ-বাগিচা,

জীবজন্তু সব ধ্বংস হয়ে যায়। তারা নিজেরাও শূন্যে উড়তে থাকে। রাতে তারা মরে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ (أَبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطن فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ

'(হুদ) বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়েই আছে, তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে, যার নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছে এবং সে সম্বন্ধে আল্লাহ কোনো সনদ (স্বীকৃতি) পাঠাননি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' (সুরা আরাফ: আয়াত ৭১)

আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে বায়ুর দেবতা, কাউকে ধন-সম্পদের দেবতা, আবার কাউকে রোগের দেবতা বলে থাকো। অথচ তাদের কেউ মূলত কোনো জিনিসের স্রষ্টা ও প্রতিপালক নয়।

'সামুদ'- জাতির উপর আপতিত গযব :

আর সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম; সে বলল, হে আমার জাতি! আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, আর তন্মধ্যেই তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল, আমার প্রতিপালক তো অতি নিকটেই আছেন, আর তিনি দু'আ কবুল করে থাকেন। তারা বলল, হে সালিহ! ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? তুমি আমাদেরকে যে দিকে ডাকছ সে সম্পর্কে আমরা বিভ্রান্তিকর সংশয়ে পড়ে আছি। সালিহ বলল, হে আমার জাতি! তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, আমি যদি আমার পালনকর্তার সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি আর তিনি যদি আমাকে

নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তার (আযাব) থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিতে চাও। আর হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, একে কোনপ্রকার কষ্ট দিও না, নচেৎ অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। তবু তারা উষ্ট্রীটির পা কেটে দিল। তখন সালিহ বলল, তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন জীবন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হতে পারে না। অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালিহকে ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনি সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। আর প্রচন্ড শব্দ পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, (ফলে ভোর হতে না হতেই) তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুর হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা কোনদিনই সেখানে ছিল না। জেনে রেখ, সামুদ জাতি তাদের পালনকর্তারকে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখ, সামুদকে (রহমাত হতে) দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। -[কুরআন ১১: ৬১-৬৮]

হযরত সালিহ (আ:) কোমল ভাষায় ও সৌজন্যমূলক আচরণের মাধ্যমে এভাবেই তাদেরকে কল্যাণের পথে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তার সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়।

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকেরা একবার এক স্থানে সমবেত হয়। ঐ সমাবেশে নবী সালিহ (আ) আগমন করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান, উপদেশ দান করেন, ভীতি প্রদর্শন করেন, নসীহাত করেন এবং তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে বলল, ঐ যে একটা পাথর দেখা যায়, ওর মধ্য থেকে যদি অমুক অমুক গুণসম্পন্ন একটি দীর্ঘকায় দশ মাসের গর্ভবতী উটনী বের করে দেখাতে পার, তবে দেখাও। সালিহ (আ) বললেন, তোমাদের বর্ণিত গুণসম্পন্ন উটনী যদি আমি বের করে দেই তাহলে কি তোমরা আমার আনীত দ্বীন ও আমার নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে? তারা সবাই বলল, হ্যাঁ, বিশ্বাস করব। তখন তিনি এ কথার উপর তাদের থেকে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এরপর সালিহ (আ) সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহর নিকট তাদের আবদার পূরণ করার প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ্ তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং ঐ পাথরকে কেটে গিয়ে অনুরূপ গুণসম্পন্ন একটি উটনী বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন। যখন তারা স্বচক্ষে এরূপ উটনী দেখতে

আল্লাহ্ তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং ঐ পাথরকে কেটে গিয়ে অনুরূপ গুণসম্পন্ন একটি উটনী বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন। যখন তারা স্বচক্ষে এরূপ উটনী দেখতে পেল, তখন অনেকেই ঈমান আনল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাদের কুফরী, গুমরাহী ও বৈরিতার উপর অটল হয়ে থাকল।

অতঃপর হযরত সালিহ (আ) তাদেরকে বললেন, এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে চরে খেয়ে বেড়াতে দাও এবং এর অনিষ্ট সাধন করোনা। অন্যথায় এক নিকটবর্তী আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। তারপর অবস্থা এই দাঁড়াল যে, এ উটনীটি তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াত, একদিন পর পর পানির ঘাটে অবতরণ করত। যেদিন সে পানি পান করত সেদিন কূপের সমস্ত পানি নিঃশেষ করে ফেলত। তাই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পালার দিনে পরের দিনের জন্যে প্রয়োজনীয় পানি উত্তোলন করে রাখত।

দীর্ঘদিন যাবত এ অবস্থা চলতে থাকায় সম্প্রদায়ের লোকের অধৈর্য হয়ে পড়ে। এর থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তারা একদা সমবেত হয় ও পরামর্শ করে। তারা

সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত করে যে, উটনীটিকে হত্যা করতে হবে। এর ফলে তারা উটনীটির কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং সমস্ত পানির উপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। শয়তান তাদেরকে এ কাজের যুক্তি ও সুফল প্রদর্শন করল।

অতঃপর তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল, আর বলল, 'হে সালিহ! যদি তুমি রসূল হয়ে থাক তাহলে নিয়ে এস যদ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ'। -[কুরআন ৭:৭৭]

এই উক্তির মধ্যে তারা কয়েকটি জঘন্য কুফরী কথা বলেছে, যথা- (১) আল্লাহ্ যে উটনী তাদের জন্যে নিদর্শন রূপে পাঠিয়ে তাকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে নিষেধ করেছে, তারা তাকে হত্যা করে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে। (২) আযাব আনয়নের জন্যে তারা বেশি রকম তাড়াহুড়া করে। (৩) তারা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তাঁর নবুওয়াতের দাবির সত্যতার পক্ষে চুড়ান্ত প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন।

শেষে তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল, আর সে তাকে ধরল এবং বধ করল। অতঃপর কতইনা কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। -[কুরআন ৫৪: ২৯-৩০] তবু তারা উষ্ট্রীটির পা কেটে দিল। তখন সালিহ বলল, তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন জীবন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হতে পারে না। -[কুরআন ১১ : ৬৫]

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতঃপর, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণতি কেমন হয়েছিল? আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এই তো তাদের বাড়ীঘর জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, কারণ তারা বাড়াবাড়ি করেছিল। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আল্লাহকে ভয় করত, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম। -[কুরআন ২৭: ৫০-৫৩]

যে কয় ব্যক্তি সালিহ (আ) কে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, আল্লাহ্ প্রথম তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। পরে গোটা সম্প্রদায়কে ধ্বংস

করেন। যে তিনদিন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছিল তার প্রথমদিন ছিল

বৃহস্পতিবার। এই দিন আসার সাথে সাথে সম্প্রদায়ের সকলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন শুক্রবারে সকলের চেহারা লাল রঙ ধারণ করে। তৃতীয় দিন

শনিবারে সকলের চেহারা কাল রঙ ধারণ করে। সন্ধ্যাবেলা তারা বলাবলি করে যে, জেনে নাও, নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। রবিবার সকালে তারা খোশবু লাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষায় থাকল- কি শাস্তি ও আযাব-গযব নাযিল হয় তা দেখার জন্যে। তাদের কোনই ধারণা ছিল না যে, তাদের কি করা হবে এবং কোন দিক থেকে আযাব আসবে। কিছু সময় পর সূর্য যখন উপরে এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন আসমানের দিক থেকে বিকট আওয়াজ এলো এবং নিচের দিক থেকে প্রবল ভূকম্পন শুরু হল। সাথে সাথে তাদের প্রাণবায়ু উড়ে গেল, সকল নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল এবং যা সত্য তাই বাস্তবে ঘটে গেল। ফলে সবাই লাশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।

হযরত লুত্ব (আঃ) এর কওমের ও গযব

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার ইবাদতের জন্য। আর তাদের সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। নারী-পুরুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য। কওমে লুত সর্বপ্রথম সমকামিতার মতো গর্হিত পাপ করে যা এর পূর্বে কোনো মানুষ করেনি।

মহান আল্লাহ যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। তারা মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে ডাকতেন এবং যাবতীয় মন্দ কাজ বর্জন করতে বলতেন। শয়তানের দুষ্ট চক্রান্ত ছিলো সবসময়ই তৎপর। সে একের পর এক মন্দ কর্ম নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হয়। আর এতে কিছু মানুষ আটকে যায়, লুফে নেয় শয়তানের প্রস্তাব।
শয়তানের জঘন্যতম একটি মন্দকর্ম হলো 'সমকামিতা'। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এ পাপাচারের ইতিহাস সম্পর্কে একদিকে যেমন মানুষকে অবগত করেছেন, অন্যদিকে এই পাপাচারে লিপ্ত গোষ্ঠীকে তিনি কীভাবে শাস্তি দিয়ে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করেছেন সে সম্পর্কেও বলে দিয়েছেন যাতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। এটা এতোই নোংরা পাপ যে অপরাধীরা এর শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়েছিলো।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি লুত (আ.) কে পাঠিয়েছিলাম যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা চরম অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ কখনো করেনি। তোমরা কামপ্রবৃত্তি পূরণ করার জন্য মেয়েদের কাছে না গিয়ে পুরুষদের কাছে যাচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি। (সুরা আরাফ: ৮০-৮১)

হজরত লুত (আ.)- এর সম্প্রদায় বাস করত সাদ্দুম নগরীতে। তারা ডাকাতি করতো, প্রকাশ্য সভা বানিয়ে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা করতো। তারা সর্বপ্রথম এমন একটি গর্হিত পাপ করে যা এর পূর্বে কোনো মানুষ করেনি।

>কওমে লুতের ওপর আল্লাহর গজব:

তৎকালীন ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী এক জায়াগায় এ জাতিটির বসবাস ছিল। কেন্দ্রীয় শহর ছিল 'সাদুম' নগরী। সাদুম ছিল সবুজ শ্যামল এক নগরী। বর্তমানে এ এলাকাকে ডেট সি বা মৃত সাগর বলা হয়। কারণ এখানে পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল। ফলে ভূমি ছিল

অত্যন্ত উর্বর। শস্যে ভরপুর। এমন প্রাচুর্যময় জীবনযাত্রায় বেপরোয়া করে তোলে তাদের। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম সমকামিতার প্রবণতা দেখা দেয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে এই জঘন্য অপকর্ম তারা প্রকাশ্যে করে আনন্দ লাভ করত। পৃথিবীতে তারাই প্রথম সমকামিতার পথ উন্মুক্ত করে। হযরত লুত আ. তাদের এ পাপকাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। আল্লাহর ভয় দেখান। কিন্তু তারা

লুত আ. এর আদেশ অমান্য করে। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেন, 'হে আমার উম্মত! আল্লাহকে ভয় করো আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুগত্য করো। এই আহ্বানের ফলে আমি তোমাদের থেকে কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় বিশ্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ দেবেন। (সুরা শুআরা আয়াত নম্বর ১৬৩-১৬৪)।

আল্লাহর পথে আহ্বান করে পরকালীন মুক্তি ও সুখময় জীবনের কথা বলেন লুত আ.। কিন্তু তারা নবীর কথা কানেই নেয়নি। উলটো তারা সমকামিতার মত ঘৃণিত কাজ বৃদ্ধি করে দেয়। লুত আ. তাদেরকে তাদের বিকৃত রুচি তথা সমকামিতা থেকে বারণ করেন। এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে খবর দেন। কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন, 'লুত আ. তার সম্প্রদায়কে ডেকে বললো হে আমার জাতি! তোমরা এমন জঘন্য অরুচিকর অশ্লীলতা শুরু করছো, তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এমন রুচিহীন কাজ করেনি।

নিশ্চয় তোমরা কামভাব পূরণার্থে পুরুষের সঙ্গ গ্রহণ করছো, নিজেদের মাঝে গর্হিত কাজ করছো। (এই কথা শোনার পর) তার জাতি লুত আ.কে জবাব দেয়, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের ওপর গজব আনয়ন করো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এই বিপদগ্রস্ত জাতির ব্যাপারে আমাকে রক্ষা করুন। (সুরা আনকাবুত আয়াত নম্বর ২৮-২৯)।

যে কারণে তাদের উপর নেমে আসে এ ভয়ংকর শাস্তি:

আল্লাহর নবী লুত আলাইহিস সালাম তাদের বারবার সমকামিতা থেকে দূরে সরে আসতে বলেছেন, কিন্তু তারা নবীর কথা না শুনে উলটো তাকে কষ্ট দেয়। কোরআনে আল্লাহ বলেন, তার সম্প্রদায় এ ছাড়া কোনো উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। (সুরাতুল আরাফ আয়াত নম্বর ৮২)। আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করে তাদের পাপাচারে সহযোগিতা করতেন লুত আ.-এর স্ত্রী। এর ফলে আল্লাহ তাআলা একদিন ভোর বেলা তাদের

ভয়ংকর ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করে দেন। ভূমিকম্প এতো শক্তিশালী ছিল যে তাদের পুরো নগরটি সম্পূর্ণ উল্টে যায়।

কওমে লুত এই বিকৃতি রুচির কাজে এতোটাই পাগলপারা ছিল, এই গর্হিত কাজের কোনো সময় স্থান কাল ব্যক্তি পরিচয় ছিল না। যখন যাকে পেত তার সঙ্গেই এই বিকৃতরুচির কাজ করতো।

একদিন হজরত লুত আ. এর নিকট আল্লাহর আদেশে ফেরেশতা আসলো। তারা সেই ফেরেশতার সঙ্গেও এই কাজ করার জন্য দৌড়ে আসে। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ কোরআনে বলেন, লুত আ. এর নিটক ফেরেশতা আসার পর শহরবাসী খুশিতে দৌড়ে আসে।

হজরত লুত আ. বললেন, এরা আমার মেহমান, আমাকে লাঞ্ছিত করো না। মেহমানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে দুঃখিত করও না। তারা বললো, আমরা কি আপনাকে দুনিয়াবাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি? তিনি উত্তরে বললেন, যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। আল্লাহ বলেন, আপনার জীবনের কসম তারা নিজস্ব ভাবনায় মত্ত। (সুরাতুল হিজর আয়াত নম্বর ৬৮-৭২)।

তারা কোনোভাবেই এ মনোবাসনা থেকে বিরত হচ্ছিল না। এরপরই আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নেমে আসে। এক শক্তিশালী ভূমিকম্প পুরো নগরটি সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। ঘুমন্ত মানুষের ওপর তাদের ঘরবাড়ি আছড়ে পড়ে।

পাশাপাশি আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ওই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি। ওই জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন, আপনি আপনার পরিবার নিয়ে শেষ রাত্রিতে চলে যান, আপনি তাদের জন্য ফিরে আসবেন না, আর আপনাদের মধ্যে হতে কেউ যেন পেছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন সেখানে চলে যান। আমি লুতকে এই বিষয়ে জানিয়ে দিই, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে। (সুরাতুল হিজর, আয়াত নম্বর ৬৫-৬৭)।

তাদের উপর গজবের বিবরণ মহান আল্লাহ বেশ কয়েকটি আয়াতে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচণ্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করলো। আমি জনপদটিকে উল্টো করে দিলাম। তাদের উপর বর্ষণ করলাম কঙ্কর প্রস্তরের প্রবল বৃষ্টি। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল জাতির জন্য রয়েছে নির্দেশনাবলি। (সুরাতুল হিজর আয়াত নম্বর ৭৩-৭৫)।

আহলে মাদয়িনার আযাব ও গযব :

হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর শত উপদেশ উপেক্ষা করে যখন কওমের নেতারা তাদের অন্যায় কর্মসমূহ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে অনড় রইল এবং নবীকে জনপদ থেকে বের করে দেবার ও হত্যা করার হুমকি দিল ও সর্বোপরি হঠকারিতা করে তারা আল্লাহর গযব প্রত্যক্ষ করতে চাইল, তখন তিনি বিষয়টি আল্লাহর উপরে সোপর্দ করলেন এবং কওমের নেতাদের বললেন, وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (ঠিক আছে), তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষায় থাক। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম' (হূদ ১১/৯৩)।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন বিধান অনুযায়ী শো' আয়েব (আঃ) ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণকে উক্ত জনপদ হ'তে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন।

অতঃপর জিবরীলের এক গগণবিদারী নিনাদে অবাধ্য কওমের সকলে নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

- (وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ (هود فاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ - كَأَن لَّمْ يَغْنَوا فيها ألا بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ৯৪-৯৫)-)

'অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি শো'আয়েব ও তার ঈমানদার সাথীদের নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন আপতিত হ'ল। ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইল'। '(তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হ'ল) যেন তারা কখনোই সেখানে বসবাস করেনি। সাবধান! ছামুদ জাতির উপর অভিসম্পাতের ন্যায় মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত' (হূদ ১১/৯৪-৯৫)। যদিও তারা দুনিয়াতে মযবুত ও নিরাপদ অট্টালিকায় বসবাস করত।

আছহাবে মাদইয়ানের উপরে গযবের ব্যাপারে কুরআনে ১টি (শো'আরা ১৮৯(, رجفة)হূদ (৯৪(صيحة)আ'রাফ ৮৮) তিন ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিকট নিনাদ, ভূমিকম্প। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আহলে মাদইয়ানের উপরে প্রথমে সাতদিন এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা দহন জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি ঘন কালো মেঘমালা পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচ দিয়ে

শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন কওমের লোকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে দৌড়ে এল। এভাবে সবাই জমা হবার পর হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হ'ল এবং মেঘমালা হ'তে শুরু হল অগ্নিবৃষ্টি। তাতে মানুষ সব পোকা-মাকড়ের মত পুড়ে ছাই হ'তে লাগল। ইবনু আববাস (রাঃ) ও মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, অতঃপর তাদের উপর নেমে আসে এক বজ্রনিনাদ। যাতে সব মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল'। এভাবে কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই আল্লাহদ্রোহীরা সবাই পায়ে হেঁটে স্বেচ্ছায় বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয় এবং চোখের পলকে সবাই নিস্তনাবুদ হয়ে যায়।
মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব ধ্বংসস্থল নযরে পড়ে। আল্লাহ বলেন।

وكم أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسكن من بَعْدِهِمْ إلا قليلاً وكُنَّا نَحْنُ (الوارثين

'এসব জনপদ ধ্বংস হওয়ার পর পুনরায় আবাদ হয়নি অল্প কয়েকটি ব্যতীত। অবশেষে আমরাই এ সবের মালিক রয়েছি' (ক্বাছাছ ২৮/৫৮)। তিনি বলেন, ان في ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ রয়েছে' (হিজর ১৫/৭৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন এসব স্থান অতিক্রম করতেন, তখন আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন ও সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে স্থান অতিক্রম করতেন। [8] অথচ এখনকার যুগের বস্তুবাদী লোকেরা এসব স্থানকে শিক্ষাস্থল না বানিয়ে পর্যটন কেন্দ্রের নামে তামাশার স্থলে পরিণত করেছে। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

ওয়াহাব বিন মুনাবিবহ বলেন, শু'আয়েব (আঃ) ও তাঁর মুমিন সাথীগণ মক্কায় চলে যান ও সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। কা'বা গৃহের পশ্চিম দিকে দারুন নাদওয়া ও দার বনু সাহ্মের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের কবর হয়'। [9] তবে এই সকল বর্ণনার ভিত্তি সুনিশ্চিত নয়। আর থাকলেও সেগুলি সবই এখন নিশ্চিহ্ন এবং সবই বায়তুল্লাহর চতুঃসীমার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর দূর্ভিক্ষ মোকাবিলা :

পবিত্র কোরআনের সুরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা নবী ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের রোমাঞ্চকর গল্প তুলে ধরেছেন। এই গল্পের অনেক চমৎকার ও উল্লেখযোগ্য দিকের একটি হলো-কঠিন দুর্ভিক্ষের আগমুহূর্তে তিনি মিসরের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সফলভাবে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করেন। সুরা ইউসুফের আলোকে এ ঘটনার প্রেক্ষাপট এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় ইউসুফ (আ.)-এর পদক্ষেপগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

মিসরের বাদশাহর অদ্ভুত স্বপ্ন:

হজরত ইউসুফ (আ.) তখন জুলেখার মিথ্যা অভিযোগে মিসরের কারাগারে বন্দী। একদিন মিসরের বাদশাহ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। রাজ্যের সভাসদগণকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চেয়ে বললেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভি সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভিকে খেয়ে ফেলছে, (আর দেখলাম) সাতটি সবুজ সতেজ শিষ আর অন্য সাতটি শুকনো। হে সভাসদগণ, আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও, যদি তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারো।' (সুরা ইউসুফ: ৪৩)

সভাসদগণ বললেন, 'নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। আর আমরা এ ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে অভ্যস্ত নই।' (সুরা ইউসুফ: ৪৪)

ইউসুফ (আ.)-এর খোঁজ মিলল যেভাবে:

কারাগারে একই সেলে ইউসুফ (আ.)-এর দুই সঙ্গী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি তাঁদের আস্থা অর্জন করেছিলেন। ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাঁদের

একজন মৃত্যুদণ্ড পান, অন্যজন জেল থেকে মুক্তি পান এবং বাদশাহর সেবক পদে নিয়োগ পান। দ্বিতীয়জনকে জেল থেকে বের হওয়ার আগে ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলিও।' (সুরা ইউসুফ: ৪২) মুক্ত হওয়ার পর তিনি সে কথা ভুলে যান। বাদশাহর এই অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়ার সময়ও ইউসুফ (আ.)-এর কথা মনে পড়েনি তাঁর।

অনেক দিন পর বাদশাহর সেই সেবকের ইউসুফ (আ.)-এর কথা মনে পড়ে এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ায় তাঁর পারদর্শিতার কথাও মনে পড়ে। তখন তিনি বাদশাহর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা এনে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কারাগারের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চান এবং বলেন, 'আমি আপনাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব, তবে আমাকে কারাগারের ভেতরে পাঠান।' (সুরা ইউসুফ: ৪৫)

ইউসুফ (আ.)-এর চমৎকার ব্যাখ্যা:

ইউসুফ (আ.)-এর কাছে বাদশাহের স্বপ্নের ঘটনা খুলে বললেন এবং ব্যাখ্যা চাইলেন। ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের এক চমৎকার ব্যাখ্যা দিলেন। সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভি ও সাতটি সতেজ শিষের ব্যাখ্যা ও করণীয় সম্পর্কে বললেন, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে। এরপর যখন তোমরা ফসল কাটবে, তখন অল্প যা খাবে, বাকি শস্য শিষসমেত সংরক্ষণ করবে।' (সুরা ইউসুফ: ৪৭)

এরপর সেই গাভিগুলোকে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভির খেয়ে ফেলা এবং সাতটি শুকনো শিষের ব্যাখ্যা ও করণীয় সম্পর্কে বললেন, 'এরপর সাতটি কঠিন বছর আসবে। এ সময়ের জন্য আগে তোমরা যা সঞ্চয় করেছিলে, তা লোকে খাবে। এরপর একটি বছর আসবে, যখন মানুষের কল্যাণে প্রচুর বৃষ্টি হবে এবং মানুষ যথেষ্ট ভোগ-বিলাস করবে।' (সুরা ইউসুফ: ৪৮-৪৯)

বাদশাহর বিশ্বস্ততা অর্জন:

ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাখ্যা বাদশাহর পছন্দ হলো। তিনি বললেন, 'তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' দূত কারাগারে এসে ইউসুফ (আ.)কে সুখবর দিলেন। ইউসুফ (আ.) বললেন, 'বাদশাহর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, যেসব নারী হাত কেটে ফেলেছিল এবং যে মিথ্যা অভিযোগে আমি বন্দী আছি, তা সমাধান না হলে আমি যাব না।' বাদশাহ বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নিলেন এবং অভিযোগকারী জুলেখা অপরাধ স্বীকার করে নেন। ফলে ইউসুফ (আ.) নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্ত হলেন। (সুরা ইউসুফের ৫০ থেকে ৫৩ নম্বর আয়াতের সারমর্ম)

এরপর বাদশাহ বললেন, 'তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাঁকে আমার দরবারে বিশেষভাবে সম্মানিত করব।' (সুরা ইউসুফ: ৫৪)

ইউসুফ (আ.) বাদশাহর সঙ্গে বৈঠক করলেন। বাদশাহ তাঁর কথায় দারুণভাবে প্রভাবিত হলেন এবং তাঁকে উপদেষ্টা নিয়োগ দিলেন। বাদশাহ বললেন, 'আজ আপনি আমাদের কাছে খুবই মর্যাদাশীল ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিগণিত।' (সুরা ইউসুফ: ৫৪)

স্বেচ্ছায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ:

ইউসুফ (আ.) জানতেন, আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় জনগণের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই অদক্ষ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব থেকে সরাতে হবে। যোগ্য কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে। ফলে আল্লাহর আদেশে তিনি বাদশাহর কাছে অর্থ, খাদ্য ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পদের আবেদন করে বলেন, 'আপনি আমাকে দেশের ধনভান্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও বিজ্ঞ।' (সুরা ইউসুফ: ৫৫)

আসন্ন বিপদ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে বাদশাহর কাছেও ইউসুফ (আ.)-এর বিকল্প ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী ও বিশ্বস্ততম ব্যক্তি। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, জাতীয় সংকটকালে গণমানুষের স্বার্থে যোগ্যদের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করা দোষের নয়।

সর্বোচ্চ উৎপাদন ও দীর্ঘমেয়াদি মজুত:

দায়িত্ব নিয়েই ইউসুফ (আ.) সর্বোচ্চ খাদ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রকল্প হাতে নেন। যেমনটি তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যার সময় বলেছিলেন, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে।' (সুরা ইউসুফ: ৪৭)

এরপর শস্য মজুত করেন এবং দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ইউসুফ (আ.)-এর ভাষায়, 'এরপর যখন তোমরা ফসল কাটবে, তখন তোমরা অল্প খাবে, বাকি শস্য শিষসমেত সংরক্ষণ করবে।' (সুরা ইউসুফ: ৪৭)

অপচয় রোধ এবং সুষম বণ্টন

দায়িত্ব নিয়ে ইউসুফ (আ.) রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়-অপব্যয় বন্ধ করেন এবং শস্যের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেন। যেমন-কোরআনের আয়াতে 'তোমরা অল্প যা খাবে, বাকি শস্য মজুত করবে' বলার মাধ্যমে ইউসুফ (আ.) ভোক্তাদের মধ্যে

অপচয়-অপব্যয় কমিয়ে আনার কথা আগেই বলেছেন। উৎপাদন থেকে কম খরচ করে বিপদের সময়ের জন্য সঞ্চয় করতে বলেছেন।

ইউসুফ (আ.)-এর সতর্কতা জারির কারণে মিসরের মানুষ দুর্ভিক্ষের জন্য ফসল সঞ্চয় করে রাখে এবং দুর্ভিক্ষের সময় নিজেদের সঞ্চিত ফসল ভোগ করতে থাকে। যেমন-পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'এরপর সাতটি কঠিন বছর আসবে। এই সময়ের জন্য আগে তোমরা যা সঞ্চয় করেছিলে, তা লোকে খাবে।' (সুরা ইউসুফ: ৪৮)

ফলে রাজভান্ডারে সঞ্চিত ফসলগুলো পরিকল্পিতভাবে অভাবীদের মধ্যে বণ্টিত হতে থাকে। এ কারণে মিসরের মানুষের তেমন কোনো দুর্ভোগ ও অভাব ছিল না। বরং পাশের ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য অঞ্চলের মানুষও মিসর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা খাবার সংগ্রহ করতেই মিসরে এসেছিলেন।

নিজেই শস্য বণ্টন করতেন ইউসুফ (আ.)

ঐতিহাসিকদের মতে, দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় ইউসুফ (আ.)-ই প্রথম রেশন কার্ড চালু করেন। ইউসুফ (আ.) নিজেই দুর্ভিক্ষকালীন কর্মকাণ্ডগুলো সরাসরি তদারক করতেন। সুরা ইউসুফের পরের আয়াতগুলোতে দেখা যায়, ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা শস্য সংগ্রহে মিসরে এলে তিনিই সরাসরি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করেন এবং বাবা-মায়ের খোঁজখবরও নেন। আবার তাঁদের আসতে বলেন এবং সহোদর বিনইয়ামিনকেও নিয়ে আসতে বলেন। পরেরবার বিনইয়ামিনকে নিয়ে এলে তাঁকে কৌশলে রেখে দেন ইউসুফ (আ.)।

এসব ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইউসুফ (আ.) নিজেই শস্য বণ্টনের কাজ তদারক করতেন এবং সবার আসা-যাওয়া পর্যবেক্ষণ করতেন। ফলে কারও অন্যায় সুবিধা নেওয়ার এবং দুর্নীতি করার সুযোগ সেখানে ছিল না।

দুর্ভিক্ষের পরের জন্য পরিকল্পনা:

দুর্ভিক্ষের পরের সময়ের জন্য যথেষ্ট বীজও সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন ইউসুফ (আ.)। স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকেই বিষয়টি বোঝা যায়। ইরশাদ হচ্ছে, 'তবে সেই অল্পটুকু বাদে, যা তোমরা (বীজ হিসেবে) সংরক্ষণ করবে।' (সুরা ইউসুফ: ৪৮)

ফলে দেখা গেছে, দুর্ভিক্ষের পর এতই ভালো ফলন হলো যে মানুষ খুব সুখে জীবনযাপন করতে লাগল। কোরআনের ভাষায়-'এরপর একটি বছর আসবে, যখন মানুষের কল্যাণে প্রচুর বৃষ্টি হবে এবং মানুষ যথেষ্ট ভোগবিলাস করবে।' (সুরা ইউসুফ: ৪৯)

সুরা ইউসুফকে আল্লাহ তাআলা 'আহসানুল কাসাস' বা 'শ্রেষ্ঠ গল্প' আখ্যা দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার পাশাপাশি এই গল্পের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য এ সুরায় রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার ও অনুধাবন করার তৌফিক দিন।

বন্যাকালীন সময়ে ইসলামে মনীষীদের অবদান ও আমাদের করনীয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা এখন প্লাবিত। ক্রমেই বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে, দেশের প্রধান নদ-নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে প্রবাহিত হচ্ছে। রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বানের পানিতে ভেসে যাচ্ছে গবাদি পশু ও মাঠের ফসল। মানুষের ক্রমবর্ধমান গুনাহের কারণে বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নির্বিচারে বন উজাড় করা, নদী-উপনদী ও খালগুলোর পানি নির্গমন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া এবং অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণসহ ভৌত অনেক বিষয়ই জড়িত এই ক্রমাগত বন্যার পেছনে। বৃষ্টি আল্লাহর পরম নিয়ামত। পানির সবচেয়ে নিরাপদ উৎস হলো বৃষ্টি। বৃষ্টির ফলেই উর্বর হয় মাটি। মাটির বুক চিরে জন্মে তরুলতা, গাছপালা, নয়নাভিরাম শস্য ও ফলমূল। মানুষ ও পশুপাখির জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যত সব রিজিক। শুধু জীবিকাই নয়, আমাদের চারপাশে জমে থাকা আবর্জনা, রোগজীবাণু ধুয়ে-মুছে করে দেয় পরিষ্কার। বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণেও বৃষ্টির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে বৃষ্টির স্বাভাবিক ধারা নিয়ামত তথা রহমত। অতিবর্ষণের ফলে তা-ই পরিণত হয় গজবে। অতিবৃষ্টির ভয়াল রূপই বন্যা নাম ধারণ করে। প্লাবিত হয় রাস্তাঘাট—সব কিছু। গাছপালা, শস্য, ফসলের মাঠ—সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেড়ে যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। রোগজীবাণু পরিষ্কার হওয়ার বিপরীতে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ।

বৃষ্টির পর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় না করাও তা গজবে পরিণত হওয়ার আরেকটি কারণ। আল্লাহ সুরা ফুরকানের ৫০ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'আর আমি তা (পানি) তাদের মধ্যে বণ্টন করি যেন তারা স্মরণ করে; কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।' অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টির নামাজ আদায় করা হয়, মসজিদে মসজিদে শুরু হয় দোয়া। আমরা বৃষ্টির আগে প্রার্থনা করলেও বৃষ্টি পাওয়ার পর আল্লাহর দরবারে আদায় করি না কোনো শুকরিয়া। বৃষ্টি পেয়ে আমাদের উচিত আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা।

বৃষ্টির রহমতের পানি যেন গজবে পরিণত না হয়, সে জন্য বৃষ্টিপ্রাপ্তির পর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং অতিবৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সব ধরনের গুনাহর কাজ থেকে তাওবা করতে হবে। মানুষের পাপের কারণে আল্লাহ যেমন বন্যা দিয়ে তাদের শাস্তি দেন, তেমনি সুউচ্চ মর্যাদা ও পুরস্কারে ভূষিত করার জন্য বন্যার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষাও করেন। যারা বানভাসি হয়েছে এবং যারা নিরাপদে আছে, তাদের উভয়ের জন্যই এ বন্যা একটি পরীক্ষা।

বন্যার্তদের ওপর পরীক্ষা হচ্ছে, তারা এই বিপদে কতটা ধৈর্য ধারণ করে। পক্ষান্তরে যারা নিরাপদে আছে, তার জন্য পরীক্ষা হলো—সামর্থ্য অনুযায়ী তারা বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসে কি না। বন্যাদুর্গতরা যেমন এই চরম বিপদে আল্লাহর কাছে সবর, তথা ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রভূত কল্যাণ ও মর্যাদা লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। পবিত্র কোরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) তোমাদের ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। (হে রাসুল!) আপনি ধৈর্যশীলদের শুভসংবাদ প্রদান করুন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৫)

তেমনি যারা বন্যায় আক্রান্ত হয়নি, তারাও ওই বন্যাদুর্গতদের জন্য ত্রাণসামগ্রী, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, খাবার স্যালাইন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। বন্যাদুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসা আজ দেশের ধনাঢ্য ও সংগতিসম্পন্নদের ওপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। বিত্তশালীরা যদি আল্লাহর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এই সব মানুষের মানবেতর জীবনযাপন দেখেও তাদের সাহায্যে এগিয়ে না এসে হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যারা বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না, তাদের জন্য আল্লাহর দয়া সংকুচিত হয়ে আসবে। নবীজি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।' (তিরমিজি : ৪/৩২৩)

পক্ষান্তরে যারা তাদের এই দুঃখের দিনে সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করে, তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করবেন। রাসুলে কারিম (সা.) বলেন, 'জমিনে যারা আছে, তাদের প্রতি দয়া করো, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিজি : ৪/৩২৩) বন্যার্তদের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করলে আল্লাহ তাদের জান্নাতে রিজিক দিয়ে সম্মানিত করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বস্ত্রহীনকে কাপড় পরাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ রেশমি কাপড় পরাবেন। যে ব্যক্তি কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পবিত্র প্রতীকধারী শরাব পান করাবেন।' (আবু দাউদ : ২/১৩০)

আমাদের যাদের সামর্থ্য কম, তারাও এই বন্যাদুর্গত ভাইবোনদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি। আমাদের পক্ষ থেকে ত্রাণ, খাবার ও ওষুধ যদি কমও হয়, তবুও আল্লাহর কাছে তা খুবই প্রিয় হবে। রাসুলে কারিম (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে (আল্লাহর কাছে তা এতই প্রিয় হবে যে), আল্লাহ একে ডান হাতে কবুল করবেন। এরপর একে দাতার জন্য তোমাদের কারো অশ্বশাবককে প্রতিপালন করার মতো

করবেন এবং প্রতিপালন করতে করতে পাহাড় পরিমাণ বড় করবেন (পাহাড় পরিমাণ দানের সওয়াব দান করবেন)।' (বুখারি : ২/১০৮)

প্রকৃতি আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহরই হুকুমে তা পরিচালিত। কাজেই আল্লাহর দিকে রুজু করা এবং তাঁর কাছে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করা মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহর হুকুম দুই প্রকারের : প্রাকৃতিক হুকুম এবং করণীয়-বর্জনীয়ের হুকুম। জীবন ও জগতে আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর, তাঁর ইচ্ছাকে রদ করার কেউ নেই।

জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে এই সত্য পুনঃপুনঃ প্রকাশিত। কাজেই তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। বিপদাপদ আল্লাহরই তরফ থেকে- এই উপলব্ধি মানুষের মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে। আর আল্লাহর ভয়ই পারে মানুষের কর্ম ও আচরণকে সংশোধন করতে। যে বান্দা ক্ষণস্থায়ী জীবনের নানা দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে এবং তাঁর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে সে চিরস্থায়ী জীবনে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে।

পক্ষান্তরে যে গাফিল ও উদাসীন থাকে এবং অবাধ্যতা ও নাফরমানীর মধ্যে সময় কাটায় সে চিরস্থায়ী জীবনে ব্যর্থ ও বন্দী হয়। কাজেই মানুষের কর্তব্য, জীবন ও জগতে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো থেকে শিক্ষা ও উপলব্ধি অর্জন করে নিজ করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং আল্লাহর ফরমাবরদারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।
আল্লাহর হুকুমে মানুষ যখন বিপদাপদে আক্রান্ত হয় তখন তার অসহায়ত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়ে, ঐ সময় আল্লাহ মহানের দিকে প্রত্যাবর্তন তার জন্য সহজ হয়ে যায়। কাজেই এ সময় আল্লাহমুখী হওয়াই স্বাভাবিকতা এবং এটিই মুমিনের গুণ। আর এ অবস্থাতেও আল্লাহর দিকে রুজু না করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এ বিপদের চেয়ে এটা বড় বিপদ।
কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
অতপর যখন তাদের কাছে আমার (পক্ষ হতে) সংকট আসল, তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয় করল না? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল তাদের কাছে শয়তান তা শোভনীয় করে দিল। -সূরা আনআম, (৬) : ৪৩

ভুকম্পন এ কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী আমাদের করনীয়:

প্রকৃতি আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহরই হুকুমে তা পরিচালিত। কাজেই আল্লাহর দিকে রুজু করা এবং তাঁর কাছে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করা মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহর হুকুম দুই প্রকারের : প্রাকৃতিক হুকুম এবং করণীয়-বর্জনীয়ের হুকুম। জীবন ও জগতে আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর, তাঁর ইচ্ছাকে রদ করার কেউ নেই। জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে এই সত্য পুনঃপুনঃ প্রকাশিত। কাজেই তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। বিপদাপদ আল্লাহরই তরফ থেকে- এই উপলব্ধি মানুষের মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে। আর আল্লাহর ভয়ই পারে মানুষের কর্ম ও আচরণকে সংশোধন করতে। যে বান্দা ক্ষণস্থায়ী জীবনের নানা দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে এবং তাঁর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে সে চিরস্থায়ী জীবনে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। পক্ষান্তরে যে গাফিল ও উদাসীন থাকে এবং অবাধ্যতা ও নাফরমানীর মধ্যে সময় কাটায় সে চিরস্থায়ী জীবনে ব্যর্থ ও বন্দী হয়। কাজেই মানুষের কর্তব্য, জীবন ও জগতে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো থেকে শিক্ষা ও উপলব্ধি অর্জন করে নিজ করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং আল্লাহর ফরমাবরদারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

আল্লাহর হুকুমে মানুষ যখন বিপদাপদে আক্রান্ত হয় তখন তার অসহায়ত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়ে, ঐ সময় আল্লাহ মহানের দিকে প্রত্যাবর্তন তার জন্য সহজ হয়ে যায়। কাজেই এ সময় আল্লাহমুখী হওয়াই স্বাভাবিকতা এবং এটিই মুমিনের গুণ। আর এ অবস্থাতেও আল্লাহর দিকে রুজু না করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এ বিপদের চেয়ে এটা বড় বিপদ।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অতপর যখন তাদের কাছে আমার (পক্ষ হতে) সংকট আসল, তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয় করল না? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল তাদের কাছে শয়তান তা শোভনীয় করে দিল। -সূরা আনআম, (৬) : ৪৩

ভূ-অভ্যন্তরে শিলায় পীড়নের জন্য যে শক্তির সঞ্চয় ঘটে, সে শক্তি হঠাৎ মুক্তি পেলে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এবং ভূ-ত্বকের কিছু অংশ আন্দোলিত হয়; এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। সাধারণত কম্পন-তরঙ্গ থেকে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তা ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

এই তরঙ্গ ভূ-গর্ভের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং উৎসস্থল থেকে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের কারণ নিয়ে ভূতত্ত্ববিজ্ঞানিরা বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করলেও

ইসলামি বিশ্বাসমতে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সতর্কবার্তা এবং আজাবের অংশ।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘বলে দাও, ‘আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম’ (সুরা আনআম: ৬৫)। তিনি আরও বলেছেন, ‘আমি ভয় দেখানোর জন্যই (তাদের কাছে আজাবের) নিদর্শনগুলো পাঠাই।’ (সুরা বনি ইসরাইল: ৫৯) সুতরাং ভূমিকম্পের মতো কঠিন পরিস্থিতি সম্মুখীন হওয়ার জন্য মানুষের কৃতকর্মেরই ফল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে বিপদ-আপদই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের হাতের কামাই। আর আল্লাহ তোমাদের অনেক (অপরাধ) ক্ষমা করে দেন।’ (সূরা শুরা: ৩০)

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা অযথা কাউকে শাস্তি দিতে চান না; বরং মানুষের ওপর যে বিপদ আসে, তা তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। ভূমিকম্পের সময় করণীয় আমল ভূমিকম্পের সময় আজান দেওয়ার বিষয়টি কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং ভূমিকম্পের সময় নফল নামাজ পড়া যেতে পারে। পাশাপাশি দোয় ও ইস্তেগফারও করা যেতে পারে।

হাদিসে এসেছে, ‘ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বসরায় ভূমিকম্পের সময় নফল নামাজ পড়েছিলেন।’ [সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদিস: ৬৩৮২] সুতরাং ভূমিকম্পের সময় আজান দিবে না। ফাতহুল বারী ২/৫২১ । এটি উপমহাদেশের বানানো একটি আমল। তারা অধিকাংশই জানে না যে ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো কিছু সাব্যস্ত করতে হলে অবশ্যই দলিল লাগবে। নচেৎ বিদআতের সংজ্ঞায় চলে আসবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করুন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত ভূমিকম্প হয়। এ কম্পন আগে থেকে আঁচ করা যায় না বলে তাৎক্ষণিকভাবে কী করবেন, তা বুঝে উঠতে পারেন না অনেকে। তাই আল্লাহর কাছে এর ভয়াবহতা থেকে পানাহ চাওয়ার পাশাপশি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয়।

মহামারী তে মুসলিম হিসেবে করনীয় ও বোঝার বিষয়:

যে কোন মহামারী হলে বুঝতে হবে সমাজে এমন কিছু পাপাচার হচ্ছে যেগুলো নিয়েমুসলমান দের কোন তিক্ততা নেই এবং এই পাপগুলা খুবই সাভাবিকভাবে সমাজে গন্য হয়। মহামারী ছড়িয়েপড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'যখন কোনা জাতির মধ্যেঅশ্লীলতা-বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়বে তখন তাদের মধ্যে এমন এমন রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।'] (ইবনে-মাজাহ)

মহামারী দেখা দিলে করণীয়:

যখন কোনো জনপদে অপরিচিত মহামারী দেখা দেয় তখন মানুষের জন্য ইসলামের দিক-নির্দেশনা হলো-'সর্ব প্রথম আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাকদীরের উপর খুশী থাকা। সাওয়াবের আশা নিয়ে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহর কাছে ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য চাওয়া।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে এসব অবস্থায় সান্ত্বনা দিতেন। হাদিসে এসেছে-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন, 'মহামারি আল্লাহ তাআলার একটি শাস্তি। তবে তা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রহমত।' (বুখারি)

তিরমিজিতে এসেছে, আরও একটি দোয়া পড়তে বলেছেন,
বিশ্বনবি (স:) বলেছেন- ['আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্বি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহওয়ায়ি, ওয়াল আদওয়ায়ি।'] অর্থ: [হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ (নষ্ট-বাজে) চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা এবং বাজে অসুস্থতা ও নতুন সৃষ্ট রোগ বালাই থেকে আশ্রয় চাই।' (তিরমিজি)

সুতরাং কোনো অঞ্চলে মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে না যেয়ে ওই অঞ্চলেই ধৈর্যধারণ করে বসবাস করা। যারা সে অঞ্চল থেকে না পালিয়ে ধৈর্যধারণ করে অবস্থান করবে, যদি তারা সেখানে মারাও যায়, এটি হবে তার জন্য শহিদি মৃত্যু। কারণ হাদিসে প্রিয় নবি ঘোষণা করেন-'আমার উম্মত কেবলই যুদ্ধ ও মহামারীতে ধ্বংস হবে।'তাই যে এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়বে সেখানে অবস্থান করে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহিদ বলে আখ্যায়িত হবে। আর মহামারী এলাকা থেকে পলায়ন করা জেহাদ থেকে পলায়ন করার মতই।

আমাদের জন্য শিক্ষা

মানুষের জীবন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় পূর্ণ। কখনো কখনো জীবন এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে, যেখানে হতাশা সহজেই গ্রাস করতে পারে। কিন্তু পবিত্র কোরআন এবং নবী-রাসুলদের জীবন আমাদের শেখায় কষ্টকে কিভাবে মোকাবিলা করতে হয়। তাঁদের জীবন থেকে আমরা পাই জীবনের সংকট মোকাবিলার শক্তি ও সঠিক পথ।

প্রথমত, **ধৈর্য ধারণের গুরুত্ব**। নবী-রাসুলরা বারবার আমাদের দেখিয়েছেন, ধৈর্যই সব সংকটের মূল চাবিকাঠি। হজরত নুহ (আ.) দীর্ঘ ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়ে মাত্র ৮০ জনকে ইসলামের পথে আনতে পেরেছিলেন। এত দীর্ঘ সময়েও তিনি ধৈর্য হারাননি। আবার হজরত আইয়ুব (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সব হারিয়েও আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। এ ঘটনাগুলো আমাদের শেখায়, জীবনের প্রতিটি সংকটই ধৈর্যের মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, **আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা**। যখন মানুষ নিজের সব প্রচেষ্টা শেষ করেও সাফল্য পায় না, তখন একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসাই তাকে সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে। হজরত ইউনুস (আ.) যখন মাছের পেটে আটকা পড়েন, তখন তার মুক্তির কোনো বাস্তবসম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে তিনি প্রার্থনা চালিয়ে যান এবং আল্লাহর রহমতে মুক্তি লাভ করেন। এটি আমাদের শেখায়, কঠিনতম অবস্থায়ও আল্লাহর ওপর আস্থা রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, **সততা ও নৈতিকতার ওপর অটল থাকা**। জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নৈতিকতা বজায় রাখা সব সময় সহজ নয়। হজরত ইউসুফ (আ.) নিজের ভাইদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। গভীর কূপে ফেলে দিয়েছিলেন। এরপর জীবনের এক পর্যায়ে এসে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই ভাইদের মুখে নিজের ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপও শুনেছিলেন।এমনকি মিথ্যা অপবাদ সত্ত্বেও নিজের সততার জন্য লড়াই করে যান। এ ঘটনা আমাদের শেখায়, জীবনে প্রতারণার মুখেও সততা ধরে রাখতে হবে। রক্তসম্পর্কীয় কেউ কারও সঙ্গে প্রতারণা করলেও নিজের সৎসাহসে অটল থাকতে হবে । হজরত ইউনুস (আ.) আটকে ছিলেন মাছের পেটে। সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় ছিল না। আল্লাহর রহমতে পেয়েছিলেন। চরম বিপদে আল্লাহর ওপর ভরসা ছাড়া যাবে না। আল্লাহর নবী হজরত আইয়ুব (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। আল্লাহ তাকে নিজে সুস্থ করেছিলেন।

চতুর্থত, **পরিবার ও পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা**। হজরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর পিতা পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও নিজের ঈমানের পথে অটল ছিলেন। অন্যদিকে মহানবী মুহাম্মদ

(সা.) মক্কার কঠিন পরিস্থিতি এবং সাহাবিদের নির্যাতনের মুখেও ইসলামের দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করেননি। তাঁদের এই অবিচলতা আমাদের শেখায়, পরিবারের ভিন্নমত বা সামাজিক প্রতিকূলতায় নিজেদের আদর্শ থেকে সরে আসা যাবে না।

পঞ্চমত, **একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতায় হতাশ না হওয়া**। হজরত আদম (আ.) একাকী সৃষ্টি হয়েছিলেন এবং পরে তাঁর জন্য সঙ্গী সৃষ্টি করা হয়। জীবনে একাকিত্ব আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তা সহ্য করা সম্ভব।

সবশেষে, **বিপদকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে মেনে নেওয়া।** মহানবী (সা.)-এর জীবন আমাদের এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

মহানবী (সা.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির ষষ্ঠ বছর। মক্কায় তিনি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। হামজা (রা.) ও ওমর (রা.)-সহ মক্কার প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। বিপরীতে মক্কায় মুশরিকদের ক্রোধ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি মহানবী (সা.)-কে থামানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছিল। অন্যদিকে গোত্র বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকেও মহানবী (সা.)-এর সাহায্য থেকে বিরত রাখতে পারছিল না মক্কার অবিশ্বাসীরা। ফলে তারা এ দুই গোত্রসহ মুহাম্মদ (সা.)-কে বয়কট করার ফন্দি আঁটে। ইসলামের ইতিহাসে যা শিআবে আবি তালিবের বয়কট নামে পরিচিত। কিন্তু মহানবী (সা.) অবিচল থেকে বিজয় অর্জন করেন। শিআবে আবি তালিবের কঠিন বয়কটের সময় সাহাবিদের সঙ্গে তিনিও কঠিন সময় পার করেছেন। তবুও তিনি ইসলামের দাওয়াত দেওয়া থামাননি। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, সংকট আসলে একটি পরীক্ষা, যা সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে পারলে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার মেলে। তাই আমাদেরকে নবি রাসুলদের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং আল্লাহর প্রদত্ত মহামারী এবং অন্য সকল বিপদ আপদে তাঁদের শিক্ষার প্রয়োগ করতে হবে।

নবী-রাসুলদের জীবন আমাদের জীবনের প্রতিটি দুঃসময়, কষ্ট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পথ দেখায়। ধৈর্য ধারণ, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা এবং নৈতিকতা বজায় রাখা তাঁদের জীবনের প্রধান শিক্ষা। আমাদের উচিত তাঁদের জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে প্রতিটি চ্যালেঞ্জে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া।

উপসংহার

মহামারী একটি মানবজাতির জন্য এক গভীর বিপদের সময়, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভাইরাস, বা রোগের কারণে হতে পারে। ইতিহাসে বহু মহামারী মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, এবং এসব মহামারী কেবল শারীরিক নয়, বরং মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরীক্ষাও বটে। মহামারীর সময় সমাজে সাধারণত কিছু অস্থিরতা, পাপাচার ও নৈতিক অবক্ষয় দেখা যায়, যা সমাজকে এক নতুন সংকটে ফেলে দেয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মহামারী একদিকে আল্লাহর শাস্তি হতে পারে, তবে এটি মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রহমতও হতে পারে, যদি তারা সঠিকভাবে তা মোকাবিলা করে।

ইসলামে মহামারীর পরিস্থিতিতে মহানবী (সাঃ) তার উম্মতকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেছেন, মহামারী আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের শাস্তি হতে পারে, তবে এটি মুসলমানদের জন্য এক ধরনের পরীক্ষা, যার মাধ্যমে তারা তাদের ঈমানের শক্তি পরীক্ষা করতে পারে।

হাদিসে এসেছে, "যখন কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে পড়বে, তখন তাদের মধ্যে এমন রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।" (ইবনে মাযাহ) এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সমাজে অশ্লীলতা ও পাপাচারের বিস্তার মহামারী এবং নতুন রোগের কারণ হতে পারে।

মহামারী সময়ের প্রধান নির্দেশনা হল ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখা।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "মহামারি আল্লাহর শাস্তি। তবে তা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রহমত।" (বুখারি)

এটি প্রমাণিত করে যে, মহামারীর সময় আল্লাহর রহমত পাওয়া সম্ভব যদি মুসলমানরা ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। মহামারী এলাকা থেকে পালিয়ে না যাওয়ার কথা বলেছেন তিনি, বরং সেখানে অবস্থান করে ধৈর্য ধরার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যারা মহামারী এলাকা থেকে পালিয়ে যায়, তারা আসলে আল্লাহর বিধান থেকে বিরত থাকে, এবং যারা ধৈর্য ধরে সেখানে অবস্থান করে, তারা শহীদ হওয়ার সাওয়াব পেতে পারে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মহামারী বা যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করবে, তাকে শহীদ বলা হবে।"

মহামারীর সময় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের আধ্যাত্মিক দিকটি অবহেলা না করা। মহানবী (সাঃ) আরো একটি দোয়া পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন যা মহামারী ও নতুন অসুখ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে।

তিনি বলেছেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্বি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহওয়ায়ি, ওয়াল আদওয়ায়ি।" (তিরমিজি)

এর অর্থ হল, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে খারাপ চরিত্র, অন্যায় কাজ, কুপ্রবৃত্তি এবং নতুন রোগ থেকে আশ্রয় চাই।" এই দোয়া আমাদের জীবনকে নিরাপদ রাখতে এবং মহামারী থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে, যদি আমরা তা আন্তরিকভাবে পালন করি।

আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মহামারী এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করা এবং সঠিক পথে চলা। এই কঠিন সময়ে আমাদের নিজেদের ও সমাজের ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। ইসলাম আমাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান দেয়, যদি আমরা সঠিকভাবে তা অনুসরণ করি।

একদিকে যেমন মহামারী আমাদের শাস্তি হতে পারে, তেমনি এটি আমাদের জন্য এক বিশাল পরীক্ষা ও সুযোগও হতে পারে। মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা অনুসরণ করে, আমরা এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে ঈমানের শক্তি ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় রেখে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি।

এভাবে, মহামারী একটি পরীক্ষার সময় হলেও, এটি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার এবং সঠিক পথে চলার একটি সুযোগও দেয়। মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা অনুযায়ী আমরা মহামারীর সময়ে আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর রহমত ও সাওয়াব লাভ করতে পারি। আমাদের উচিৎ এই কঠিন সময়কে আধ্যাত্মিক ভাবে শক্তি লাভের এক সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করুন এবং সকলকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।

আমিন।